নায়িকা-প্রতিনায়িকা

কবিতা সিংহ

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রাতৃপ্রতিমেষু

নায়িকা-প্রতিনায়িকা

। নায়িকা ॥

—কি করছেন ?

—আরে, আপনি, কতদিন পরে, আসুন, বসুন !

গৃহকর্ত্রী ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিলেন। অতিথিকে দেখে একটু ওঠার ভঙ্গি করলেন। শীতের ঝিম্ দুপুরে নতুন ঝক্‌ঝকে বাড়ির ভিতরের দিকের লম্বা টানা বারান্দা। বারান্দা দিয়ে পিছন দিকের বাগান, বাগানের পর গলা সমান পাঁচিল, পাঁচিলের ওপাশে নীচু জমিতে কয়েকটা বাবলা গাছ, তারপর শহরতলির লোকাল ট্রেনের লাইন বাঁধানো উঁচু রেলরাস্তা।

এখন বারান্দার রেলিঙে রোদের কল্যাণে সুন্দর নক্‌সা। গোলমোরের চিক্‌রি কাটা ডালপালার মধ্যে দিয়ে চাপ চাপ সুখাবহ অলস রদ্দুর মহিলার কোলে পায়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। পাশের ত্রিপয়ে চশমা, এক গ্লাস জল, ওষুধের একটা ফাইল আর একটা ইংরেজি উপন্যাস ছিল। উনি কিন্তু এসব হয় ব্যবহার করে ক্লান্ত হয়ে কিম্বা আদৌ ব্যবহার না করে পেয়ারা আম আর বাড়ির পিছনের পাঁচিলে ওঠা অচেনা বুনোলতার ঝোপের ওপাশে আকাশের শেষ প্রান্তে চোখ রেখে বসেছিলেন।

দ্বিতীয়ার সম্মানার্থেই যেন দূরের দৃষ্টি নিকটে ফেরালেন।

—হাতে কী ? ওঃ সেই বোনাটা ?

সামনের চেয়ারটিতে বসতে বসতে দ্বিতীয়া বললেন,—হ্যাঁ, নাতনীর জাম্পারটা, হাতের কাছটায় আট্‌কে গেছি, আপনি না দেখিয়ে দিলে আর এগুতে পারছি না।

—ভাগ্যিস আট্‌কে পড়েছিলেন, তাই দেখা মিলল, না হলে ত'…

—আপনি ঠিকই ধরেছেন, এত নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, দরকার ছাড়া সত্যিই আসা হয়ে ওঠে না, আর আপনি বোধ হয় খুব একটা ভিড় পছন্দও করেন না

—না ঠিক তা নয়, তবে সবাইকে পছন্দ করি না। বাড়ি করে এ পাড়ায় থাকতে আসার পর একমাত্র যা ওই আপনার সঙ্গেই,…কই দেখি, আপনার বোনাটা !

গৃহকর্ত্রী হাত বাড়ালেন।

সেলাইটা কোলে রেখে তিনি চোখে চশমা দিলেন। গৃহকর্ত্রী নীচু হয়ে সেলাইটা দেখছিলেন। আর অতিথি দেখছিলেন তাঁকে।

কালো আয়ত অত্যন্ত বৃহৎ দুটি চোখ। ডিম্বাকার লম্বা ছাঁদের মুখ! বয়স গাল দিয়ে গড়াতে চেষ্টা করেছিল। তেমন সফল হয়নি। কেবল গাল দুটিকে সামান্য অসমতল করে দিয়ে গেছে। শরীর শুষ্ক। যৌবনের দেহাতিরিক্ত মেদ রাখেনি। কিন্তু বোধ হয় একটা বয়স আসে যখন চামড়ার নীচে সামান্য একটু মেদের আস্তর না থাকলে তলার ঈষৎ স্থানচ্যুত পেশিসংস্থানগুলিকে তত শোভন দেখায় না।

এখন হাল্কা চাঁপা রঙের টাঙাইল শাড়ির তলায় স্তন দুটি খুব অস্পষ্ট। পাৎলা শাড়ির ভিতর দিয়ে সায়ার মূল্যবান চিকণের কাজ দেখা যায়। সেই সঙ্গে দুটি অস্থিসার পলিত উরুর আভাস।

সম্ভবতঃ মহিলা কোনো সন্তান ধারণ করেননি।

কিংবা ধারণ করলেও সে জননীর শরীরে এমন কোনো ছাপ রাখতে পারেনি যাতে করে মহিলাকে কারো মা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

হাতে সোনা বাঁধানো লোহা, আর খুব দামী কারিগরের তৈরী এক জোড়া সূক্ষ্ম কাজ কঙ্কণ ছিল। তিনি যখন সেলাইটা পরীক্ষা করছিলেন তখন তাঁর কঙ্কালসার আঙুলে পনেরটা হীরের ভারী মার্কুইস আঙটিটা আলো ফেরাচ্ছিল।

কয়েকটা চড়ুইএর গলায় মানুষের চুমুখাওয়ার মত শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ না থাকলেও সারা বাড়িটার ঘাড়ের ওপর কেমন যেন একটা ভারি স্তব্ধতা চাপানো। ঘরগুলোর সার সার দরজায় হু হু পর্দা উড়িয়ে বাইরের কাউকে ভেতরে আমন্ত্রণ জানালেও যেন কিছুতেই ভেতরে যাওয়া যায় না। যদিও বাইরে থেকে অন্দরের আসবাবের ঝিকিমিকি দেখা যায় তবু মনে হয় ভিতরগুলো বড় একলা বড় ফাঁকা।

—ছেলের চিঠি পেয়েছেন?

—নাঃ!

—কর্তা কখন ফিরছেন?

—কলকাতাতেই নেই।

— কেন?

—বাতাসপুরে ফ্যাক্টরির নতুন প্ল্যানট বসছে, নিজেই সাইটে গেছেন!

—আপনার খুব একলা লাগে, না ?

মহিলা চোখ তুলে তাকালেন। কলিক পেন্, মৃত্যুর খবর, বা যৌন-সংগমের সময় ভিতরের যন্ত্রণায় চোখ এমনি অসম্ভব আহত দেখায়। কিন্তু ঠোঁট হাসছিল।

নীচু গলায় বললেন,—এখন মনে হয় ওঁর কথায় চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছি !

—চাকরির জন্য এত বছর বাদে আক্ষেপ !

—তা সত্যি, তা বাইশ-তেইশ বছর লেগে থাকলে কোন না হেড মিস্ট্রেস্ হোতাম।

দুজনেই মিলিত কণ্ঠে একটু হাসলেন। কিন্তু এতটুকু হাসিতে এমন কিছু এধার-ওধার হল না।

পানাপুকুরে ঢিল ফেলার মত। একটু স্বচ্ছ জল দেখিয়েই পানাগুলো আবার ধীরে ধীরে সরে এসে জুড়ে তেড়ে নিখুঁত হয়ে গেল। নিস্তব্ধতার ভার আবার যেমন কে তেমন ফিরে এল।

—বাড়ির সামনের ঢাকা বারান্দায় বসাই যায় না। শীতের হু হু হাওয়া এসে লাগে। রাস্তা দিয়েই বা কটা লোক যায়? দিনে কবার ট্রেন যায় মাঠ পার দিয়ে! আর ওঁর ঘর গুছোতে গেলে জানলা দিয়ে আপনাদের আর বোসেদের বাড়িটা দেখতে পাই।

—বিকেলের দিকে কলকাতার দিকে যান না কেন ? ড্রাইভার ত সারাক্ষণ বসেই থাকে।

—কোথায় ? ভবানীপুরে ?

—হ্যাঁ, গেলেই পারেন ত। ওখানেই ত আপনার বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি, সিনেমা, আত্মীয়স্বজন।

—বয়স ত কম হ'ল না। সে সবও করে দেখেছি।

—ভালো লাগে না বুঝি ?

—নাঃ। কোথাও জমে না।

জীবনের তাকে বয়স জমা হ'তে হ'তে তাকগুলোই বেঁকে গেছে। দ্বিতীয়া লক্ষ্য করছিলেন। সম্মুখবর্তিনীকে দেখে মনেই হয় না তিনি কোনোদিন ছেলের বিয়ে দিয়ে নাতনীর কাঁথা বদলাবার বাসনা রাখেন। অথবা সন্তর্পণে রেফ্রিজারেটর খুলে প্রাপ্যের বেশি একটা বাড়তি সন্দেশ জিভে গুঁড়িয়ে জীবনের

প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেন। একদিন তাঁর শোবার ঘরেও গিয়ে বসেছিলেন দ্বিতীয়া। একার ঘর। অথচ মস্ত বড়। প্রায় খালি। কিন্তু বোঝা যায় মূল্যবান ড্রেসিং টেবলটা তিনি বহুক্ষণ ব্যবহার করেন। খাটের পাশের টেবলল্যাম্পটা রাতে অনেকক্ষণ জ্বলে এবং তলার তাকগুলিতে নানারকম ওষুধের ফাইল প্রতিদিন ব্যবহৃত হয়। তাঁর ইংলিশ খাটের মাথার কাছে দেয়ালে তাঁর অসাধারণ সুন্দর স্বামীর এ্যানামেল-পেন্ট-করা সোনালী ফ্রেমে বাঁধা রঙিন ফটোগ্রাফ, তাঁর ছেলের শৈশব কৈশোর, কৈশোরের বহু অমূল্য মুহূর্তের ছবি সদর্পে অপেক্ষমাণ রয়েছে। তিনি এসব সকাল বিকেল হয়ত অভ্যাসবশত দেখেন। হয়ত দেখেন না। কিন্তু এসব নিয়েও যে খুব একটা নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন এমন মনে হয় না।

অবশ্য আপাতত তিনি একমনে সেলাই দেখছেন।

—আমাদের সত্যি বিষম মুস্কিল। বিয়ের পর জীবনটা এমন অন্যরকম হয়ে যায়। বন্ধুবান্ধব-থেকে আলাদা, অন্য পরিবেশ, পুরুষদের ওদিক দিয়ে কোনো অসুবিধেই হয় না।

—সত্যি।

—বর্ধমানে যে গাছ জন্মালো, দেখুন না তার চারা উপড়ে নিয়ে পোঁতা হ'ল হয়ত কলকাতার বড়বাজারে।

—দিব্যি বলেছেন কিন্তু!

—প্রাণের কথা যে, আমি ত মফস্বলের মেয়ে। এত দেশের কথা মনে পড়ে জানেন! কতদিন হয়ে গেছে তবু। স্কুল, খেলার মাঠ, বিকেল, বন্ধুরা। মাকে বাবাকে যত না মনে পড়ে তার চেয়েও,—

—ছোটবেলাটাকে মনে পড়ে, তাই না?

দ্বিতীয়ার চোখ মুখ কেমন অদ্ভুত একটা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রিন্‌রিনে গলায় তিনি বললেন, ছোটবেলা জানেন বাড়ির কাছের আমবাগানে খেলাঘর পেতে সে কি খেলা। কি আনন্দ। সে আনন্দের কোনোদিন কি কোনো তুলনা পেলাম? অথচ দেখুন সে আর কটা বছরেরই বা স্মৃতি। ছ' বছর বয়সেই ত কলকাতায় চলে আসতে হ'ল।

—আপনার ছোটবেলার স্মৃতিগুলো ভারী সুন্দর। তাই ভুলে যেতে চান না। মনে রাখেন—

—আর আপনার? আপনার বুঝি সুন্দর না?

মহিলা উত্তর দিলেন না। তিনি খানিকটা পশম খুলে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। কোঁকড়া পশমগুলো তাঁর কোলের উপর স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রইল। হঠাৎ সেগুলো নিয়ে দেখা গেল তিনি বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। খানিকক্ষণ পরে চোখ তুলে তাকিয়ে অতিথিকে বললেন,—আপনাকে দেখলেই মনে হয় আপনি জীবনে অনেক বন্ধু পেয়েছেন। 'আমি কিন্তু চিরকালই খুব নিঃসঙ্গ।

—কথাটা বলে দিতে হয় না। বুঝতে পারা যায়। বোসেদের গিন্নী বলছিলেন ওঁদের বাড়ি চায়ের নেমন্তন্নে গিয়ে আপনি নাকি কোনো কথাই বলেননি।

—বলিনি। ভালো লাগছিল না। আর জানি, সেই অপরাধে ওঁরা আর আমাদের বাড়ি আসেননি। কিম্বা চায়ের আসরেও আর ডাকেননি।

—ছোটবেলা আপনি কি কলকাতায় ছিলেন?

—না, কলকাতার বাইরে। একটা হোস্টেলে থাকতাম। বিশেষ মিশুক ছিলাম না। রুমালে বাদাম বেঁধে হাতে যা হোক একটা গল্পের বই নিয়ে মেয়েরা যেখানে খেলত সেই মাঠ ছাড়িয়ে কম্পাউণ্ডের শেষে একটা রাধাচূড়া গাছের তলায় বসে কতগুলো বিকেল যে কাটিয়ে দিয়েছি তার সংখ্যা নেই। ছুটি হয়ে গেলে রোজ সেই বিশাল স্কুলবাড়িটা তার ফাঁকা ফাঁকা ঘরগুলো আমাকে গিলে খাবার চেষ্টা করত। হাসলেন যে?

—আজো সেই একই ব্যাপার বলে। এই বিশাল বাড়িটা রোজই আপনাকে গিলে খাবার জন্য বিষম চেষ্টা করে, তাই না?

করে না আবার!

—আমি ত ঘুরতে ফিরতে আপনাদের বাড়িটার দিকে তাকাই। দিনের বেলা তবু একরকম সয়ে যায়। কিন্তু রাতে? আমার উঠোন থেকে একটা আলোও দেখা যায় না। কালো অন্ধকার একটা চাঙড়ের মত বাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকে। আপনি যে কোন্ দিকে আপনার শোবার ঘরে বসে টেবল্‌ল্যাম্প জ্বেলে পড়েন কে জানে?

—আমার স্বামী যখন বাড়ি আসেন তখন ত আপনাদের প্রায় একঘুম হয়ে যায়!

—তাই হবে হয় ত—

—আর খোকার ত এ বাড়িই পছন্দ নয়। ছুটিতেও বাড়ি আসতে চায় না। যদি বা এলো ত ভবানীপুরে ওর দাদু-দিদিমার কাছেই থাকতে চায়। আমি বাধা দিই না।

দ্বিতীয়া কোনো মন্তব্য করলেন না। গৃহকর্ত্রীই বলে চললেন,

—তবু ভালো। ওঁর বিলাসগঞ্জের সেই বুনোভিলার তুলনায় এ বাড়ি ত স্বর্গ। বিয়ের আগে স্কুলে চাকরি করতাম, টিউশনি করতাম। কোয়ার্টারে ফিরে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমোতাম। ছুটিতে কলকাতায় গেলে বাবা-মা'র কাছে থাকতাম। ছোট ভাড়াটে বাড়ি, অনেকগুলো ভাইবোন থাকলে যা হয়। সব সময় হৈ-হট্টগোল চেঁচামেচি। বিয়ের পর উনি নিয়ে গিয়ে তুললেন বিলাসগঞ্জের সেই বুনো বাংলোয়। ত্রিসীমানায় লোক নেই। চাকরবাকর কজন ছাড়া। আর উনি ত নতুন ভয়ানক ব্যস্ত।

—তাহ'লে ত এখন আপনার এখানকার এই পরিবেশকে ভিড় মনে হওয়া উচিত।

—তাই ত ভেবেছিলাম। কলকাতার নতুন অঞ্চলে বাড়ি হচ্ছে, খোকাকে কাছে পাবো, উনি বেশি কাজের ভার নেবেন না। বেশ থাকা যাবে। কিন্তু ওঁরও ছুটি নেই। খোকার ত হোস্টেলে না থাকলেই নয়। তারপর পাস করেও ত জাহাজে-জাহাজেই ঘুরবে, তাই বড় একা লাগে।

—সত্যি জানেন। বোধ হয় মেয়েদের এই বয়সটাই একা হবার বয়স। আমার একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। ও-ও প্রায় এই কথাই বলে। বলে মানে, লেখে। ঠিক আপনার মত ওরও একটি সন্তান। মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিয়েছে বছর দুই। এখন বড় একা। স্কুলে চাকরি করে। বয়স হয়েছে। তবু মেয়েটা থাকলে দুজনে গল্প করে কাটাত। মেয়েটা মাকে দুটো রেঁধে দিত। এখন আর কেই বা কি করে?

—ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে এখনও যোগাযোগ রয়েছে আপনার?

—রয়ে গেছে, জানেন। বোধ হয় ওর জীবনটা খুব সুখের নয় বলেই যোগাযোগটা ছিঁড়ে যায়নি।

দ্বিতীয়া একটু থামলেন।

—সামান্য একটু বোঝার ভুলের জন্য, একটু দেরিতে বোঝার জন্য যে কি হয়ে যায়, কি বিষম ভুল। মানুষের সারাটা জীবনকে দুমড়ে মুচড়ে পালটে নিতে হয়।

এই করুণ কথাগুলি বলতে বলতেও দেখা গেল তিনি হাসছেন। কষায় হাসি। তাঁর সারিবদ্ধ দাঁত দেখা গেল।

এখনো আশ্চর্য শাদা আর সুন্দর।

—হাসছেন যে। মনে হচ্ছে আপনার কিছু মনে পড়ল ?

—মনে পড়ল নয়, মনে আছে। মনের ভিতর সব সময় আছে। ঢাকা খুললেই মাছি বিরক্ত করে।

—জানেন আমাদের চারপাশে যে সব সাধারণ ঘটনা ঘটে তারা পচনশীল নয়। খাওয়া, ঘুমোনো, বেড়ানো নিয়মিত, স্বামী এলে খেতে দেওয়া, ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনো দেখা, চাকরি করা এই সব। আরো কত বলব ?

—কিন্তু বাঁধানো রাস্তা ছেড়ে যদি একটু এপাশে ওপাশে মন যায়, অমনি টের পাবেন কি ভয়ঙ্কর ভাবে কোণা বেঁকে মন হু হু করে বিপথে চলেছে আর পিছনে ক্ষুব্ধ জনতা, পুলিশের গাড়ি, সমানে বেজে যাওয়া সাইরেন, সার্চলাইট্।

—সে তবু সওয়া যায়। কিন্তু বুকের ওপরে জামা, জামার নীচে বুক, তার তলায় চর্বি, পেশি, পাঁজরের হাড়, হাড়ের তলায় যন্ত্রপাতির গলিঘুঁজির মধ্যে কোথাও চোরের মত মন চুপিসাড়ে ফেরারী হয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে। কেউ কিছু জানবে না। কারণ বাইরে বেরোনোর সময় তার ফোঁটা কাটা, মালা চন্দন। কিন্তু যদি মন একবার নিজেকে প্রকাশ করে ফেলে।

—এই বাঁধানো পরিষ্কার সম্বন্ধের বাইরের কোনো সম্পর্ককে যা মনে মনে স্বীকার করে নিলে কেউ দেখতেও আসত না তাকে, সেই সম্বন্ধকেই কথায়, আলোচনায়, ঘটনায় স্বীকার করে নেয়, উঃ ঠিক তখন, সেই মুহূর্ত থেকে,—

দ্বিতীয়া প্রথমার মুখের দিকে চকিতে তাকালেন, —কি হয় ?

—একটা ঘা জন্মায়।

তাঁর ঠোঁটের কোণ ঈষৎ যন্ত্রণায় একটু বাঁকা লাগল।

—সত্যি জানেন, যখন কিছুতেই সহ্য করতে না পেরে নিজের বুক চিরে ক্ষতটা দেখলাম, তখন দেখতে বড় সুন্দর লাগল। সুন্দর চেরা দাগ। টাট্‌কা। লাল স্থিতিস্থাপক পেশী, চুনীর ফোঁটার মত ঝলমলে লাল রক্তের ফোঁটা টুপ্ টাপ্ ঝরে পড়ছে, কিন্তু খানিক বাদেই চামড়া কুঁচকে ম্লান হয়ে ঝুলে পড়তে শুরু করল। পচন লেগেছে। পান খাওয়া শুকনো ঠোঁটের মত ক্ষতের চারপাশে শুকনো খয়েরী দাগ। তেলাবাঁধা কাল্‌চে রক্তের বিন্দু, কালো পেশী ফুলে ফ্যাকাসে, বাতাসে ঘুরপাক খাওয়া বীজাণুতে ক্ষতের কিনারায় কিনারায় গাদ, খানিক বাদে শাদা থকথকে মৃত শ্বেত-কণিকা পুঁজ! মহিলা তাঁর নিরাশ্রয় শীর্ণ গ্রীবা ঈষৎ যন্ত্রণায় সামান্য মোচড়ালেন। সেই জন্যেই ত সব ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখতে হয়। খুলে দিলেই মাছি। স্মৃতিরা মাছির মত। খোলা পেলেই

বড় বিরক্ত করে।

দ্বিতীয়া পানের কৌটো খুলে একটা পান খেলেন। তিনি সামান্য স্থূল। সাধারণ ভাবে শাড়ি পরেছেন। ফরাসডাঙ্গা শাড়ি। যার দাঁত-বসানো হাতা-পাড় দেখলেই মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। চিবুকের ডৌলটি একটু স্থানচ্যুত। বয়স তাঁর মুখে সময়োচিত কিছু রেখা টেনে গেছে। একটু ইতস্তত করে তিনি বললেন,—আজকে বরং আমি যাই, মনে হচ্ছে আজকে আপনার মন ভালো নেই।

—না, বরং আজ সেলাইটা থাক। আর আপনিও থাকুন। গল্প করা যাক।

—আজ আপনি একটু অস্থির বোধ করছেন, তাই না? আপনার কিছু মনে পড়ে গেছে? গোপন কিছু?

মহিলা পাশের ত্রিপয় থেকে ওষুধের ফাইলটা তুলে নিলেন। ঢাকনি খুলে, একটি শাদা বড়ি বের করে পুঁথির ঘুমুর বাঁধা লেসের ঢাকনি খুলে খানিকটা জল সমেত উদরস্থ করলেন।

-- এই সময়টাতে আমাকে জখম হওয়া হার্টের জন্য এই ওষুধটা খেতে হয়। আপনি কি যেন বলছিলেন না? গোপনীয়তা? দেখুন, আমাদের বয়স এখন পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। এখন আমরা যে সময়ের মধ্যে, তাতে আমরা কেউই আর নতুন করে হব না। দুর্ভাগ্য। আমরা ত আর ওই গোলমোর গাছ নই। বছর না ঘুরতেই যে বুড়ো শরীরকে ভুলে গিয়ে নির্লজ্জের মত ফুল ফোটায়, ফল ধরে, ডাল বাড়ায়। বরং বলতে পারেন আমরা এখন ফেল-করা-ব্যাঙ্কের বাঁধানো চেক্‌বই-এর মত। পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

ধরুন, আমি মরে গেলে, খোকার ঘরে হয়ত তার জীবদ্দশা পর্যন্ত আমার একটা ফটো ঝোলানো থাকলেও থাকতে পারে। খোকার ছেলে কিন্তু ওই অচেনা বুড়ীর ফটোটা নিয়ে খুব একটা মায়াকান্না কাঁদবে না। শেষ পর্যন্ত ঘর থেকে সরিয়ে হয়ত সিঁড়ির পাশে, যেখানে হোয়াটনটের ফাঁকে একটা জাপানের নিসর্গ শোভার ছবি আছে সেখানে রাখবে। তারপর ছবি আপনিই জীর্ণ হবে। অদরকারী বোঝা হবে। খোকার ছেলের ছেলে হয়ত আমার ছবি রাখার মত জায়গায়ই খুঁজে পাবে না সারা বাড়িতে।

এখন বয়স গেছে। যৌবন গেছে। এখন এমন কি নিজের স্বামীর কাছেও স্বচ্ছন্দে বলা যায় যৌবনে আমি অমুককে ভালোবাসতাম। যৌবনের পরম শত্রুরও ছুরিতে এখন খয়েরী মরচে।

লাবণ্যলতার কথা জানেন, একদিন মনে মনে ভাবতেও ভয় পেতুম। এখন সময় পেরিয়ে এলে মনে হয় ওটা আর পাঁচটা ঘটনার মতই একটা। লাবণ্যলতা আমার বান্ধবী। তারই জীবনের গল্প। আপনাকে, এমন কি এই ক'মাসের পরিচয়ে, কত সহজেই আজ বলে দিতে পারছি। অথচ, মহিলা, সেলাইটা নামালেন। রোদ লোহার গ্রীলের নকসার তেরছা ছায়া ফেলেছে লাল সিমেণ্ট বাঁধানো টানা বারান্দায়। সারা বাড়িতে সেই চড়ুই-এর চুমু খাওয়ার মত শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। পেয়ারা পাতা আর গোলমোরের ডাল সরিয়ে সরিয়ে সারা মাঠঘাট আর রেলরাস্তা ছড়ানো দুপুর গুটি গুটি এগিয়ে এসে সারা বাড়িটার ওপর ঝুঁকে পড়ে যেন কামুফ্লাজড্ হয়ে গেল।

দ্বিতীয়া চেয়ারের ওপর দুটি পা তুলে জোড়াসন হয়ে বসলেন।

—লাবণ্যলতার গল্প না শুনে আমি কিন্তু আজ উঠছি না।

—হঠাৎ এমন প্রতিজ্ঞা যে? পারবেন পাঁচটার পর থাকতে? মন উস্‌খুস করবে না? কোন একজন ভদ্রলোকের নাকি অফিস থেকে ফিরে আপনার হাতের চা নিমকি না পেলে দারুন মন খারাপ হয়ে যায়?

—এখন বারোটা। পাঁচটা পর্যন্ত টানা পড়ে গেলে এখনো দুশো পাতার ডিটেক্‌টিভ্ বই শেষ করে ফেলতে পারি। আপনার লাবণ্যলতার গল্প কি তার চেয়েও বড়?

—আপনার সঙ্গে সত্যি কথায় পারা যায় না। শুনুন, লাবণ্যলতা আমার বন্ধু ছিল। আমি কলকাতার কাছাকাছি একটা হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করতাম। আমার বাবার ছিল বদলির চাকরি তাই হোস্টেল ছাড়া আর উপায় কি?

লাবণ্যও একদিন সেই স্কুলে পড়তে এল।

আমার মনে আছে দিনটা। সতেরই জুলাই। তখন ভর্তি হবার সিজন ছিল না। আমাদের ভূগোলের দিদিমণি মারা গেছেন বলে শোকসভা হবার পর ছুটি হয়ে গেছে। ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা যে যার মনে আছি। কেউ হোস্টেলে। কেউ স্কুল বিল্ডিং-এ! বিশেষ কিছুই করছি না। আড্ডা-টাড্ডা দিচ্ছি। লীলা এসে খবর দিল একজন নতুন মেয়ে এসেছে আমাদের স্কুলে।

আমরা ছুটে দেখতে গেলাম।

করিডোরে জল পড়ে চকচক করছে। তার শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে

মেয়েটি। সঙ্গে একটা তোবড়ানো স্যুটকেস। দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর শতরঞ্চি দিয়ে বালিশ বাঁধা পুঁটলির মধ্যে কোনো তোষক আছে বলে মনেই হ'ল না। রোগা, কালো অত্যন্ত সাধারণ একটি মেয়ে। সময় বুঝে চটির স্ট্র্যাপ্‌টাও ছিঁড়ে গেছে। সেটা লজ্জায় ছেড়ে খালিপায়ে হেঁটেও আসতে পারছিল না মেয়েটি। খোঁড়াতে হচ্ছিল। আমরা গা-টেপাটিপি করে হাসছিলাম।

আমারই ঘরে আমার পাশের খালি খাটটায় লাবণ্যের স্থান হ'ল। লাবণ্যের একটা গোপন নামও হ'ল। নামটার অবশ্য কোনো মানে আশা করবেন না। আপনিও ত স্কুলে পড়েছেন। নিশ্চয়ই মেয়েদের আর দিদিমণিদের নতুন নতুন মজার নাম দিয়েছেন্।

বৃষ্টির দিন ভিজতে ভিজতে উড়নচণ্ডীর মত এসেছিল বলে আমাদের দলের নতুন পাণ্ডা ইন্দিরা ওর নাম রাখলে বন্যাত্রাণ।

'বন্যাত্রাণ' আমার পাশে এসে তার দীন বিছানাটি যে খুলবে তারও উপায় নেই। শাড়ি বদলাবে তোব্‌ড়ানো স্যুট্যকেসে কি আছে দেখবার জন্য ভিড় হয়। কৈশোরে মানুষ সব চেয়ে নিষ্ঠুর। গলায় দড়ি বেঁধে বেড়ালছানা কুকুর-ছানা নিয়ে ঘুরে ঘুরে সেগুলোকে মরতে বাধ্য করে ডাস্ট্‌বিনের ধারে ফেলে দেওয়া কত দেখেছি। লাবণ্যকে কেউ আমরা রেয়াৎ করিনি।

আমাদের সুবিধা এইজন্য যে লাবণ্য বড় অসহায় দেখতে। সে বড়লোকের মেয়ে নয়। তার চারপাশে সম্পদের কোনো মহিমা নেই। বড় সহজে তাকে ছোঁয়া যায়। ঘাঁটা যায়। বর্ষাকালে আমাদের হোস্টেলের অনেকে হাতে করে মুঠো মুঠো নুন নিয়ে খেলার মাঠের মাটি খুঁড়ে ওঠা কেঁচোর গায়ে নুন ঢেলে দিতাম। তারপর তার রক্ত দেখা পুরোনো হতে না হতেই অন্য মজা শুরু হ'ত। পাছে বাদ পড়ি তাই সেই যন্ত্রণায় কুঁচকে ওঠা কেঁচোকে ছেড়ে আমরা ছুটতাম অন্য মজার দিকে।

বেচারী লাবণ্য, তার নখ দাঁত কেন? শরীরে একটু আঁশও ছিল না কোথাও।

আপনাকে ত বলেছি, আমার পাশের খাটে লাবণ্য শুতো। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন রাত্রি নটার সময় আলো নিভোনোর হুকুম দিয়ে চলে যেতেন, আমরা খানিকক্ষণ রেবার খাটে চুপচাপ শুয়ে থাকতাম। বাক্সে মোমবাতি কেনাই থাকত। তাই জ্বেলেই দেওয়ালী। কেউ লুডো খেলতে আরম্ভ করতাম। কিম্বা দিদিমণিদের নকল করা।

লাবণ্য কিন্তু আমাদের দলে যোগ দিত না। মুখের ওপর চাদর চাপা দিয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকত। আমরা প্রথম প্রথম ভেবেছি এসব বুঝি নতুন নতুন আসার লজ্জা। যখন খেয়াল হয়েছে, ফস্ করে চাদর টেনে সরিয়ে দিয়েছি—এই বোকা মেয়ে, ওঠো ?

—বন্যাত্রাণ ওঠো !

লাবণ্য কোনো কোনো দিন নিঃসাড় হয়ে চুপচাপ থেকেছে, কোনো কোনো দিন চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে। কখনও দিদিমণিকে বলে দেব বলে শাসিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমার হাতে পায়ে ধরে তাকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য অনুনয় করেছে।

—আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমার ওসব ভালো লাগে না। আমরা সে সময় কেউ অসম্ভব বেলায় উঠতে পারলে খুব খুশি হতাম। কেউ অসম্ভব ভোরে। ভোরে যারা উঠত, তারা প্রাতঃভ্রমণের ছল করে সময়ের খানিকটা বড় টুক্‌রো নিজেদের জিম্মা করে রাখত।

স্কুলের খালি কম্পাউণ্ডে তারা মালীকে অনুনয় করে দোল্‌না টাঙিয়ে নিত। তারপর যত খুশি দোলা। লাবণ্য কোনোদিন আমাদের সেই ভোরে ওঠা দলের সঙ্গে ঘোরেনি। কিন্তু সেও ভোরে উঠত। খুব ভোরে। আমার পাশেই তার ঘাট ছিল। আমি তাকে চাদরের মধ্যে নড়তে দেখতাম। তেরোবছরের একটা মেয়ে কি করে জেগে জেগে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে ভাবতেও পারতাম না।

—কিন্তু আমাদের সময় দেখুন, তেরো বছরের মেয়েরাও গল্পে উপন্যাসে এমন কি বাস্তবেও কখনো কখনো নায়িকা হয়েছে।

—তা হয়েছে। সত্যি ! আমি এরকম একজনকে জানি। তবে হোস্টেলের মেয়েদের বিশেষ করে মফঃস্বলের মেয়েদের মধ্যে অত বেশি নায়িকা হবার সুযোগ ছিল না।

—বাঃ হোস্টেলে না হোক, বাড়ি যেত না মেয়েরা ?

—বাড়ি, বাড়ির বদ্ধতা তখনকার কালে আরো গলা চেপে ধরত। দ্বিতীয়া হাসলেন। তাঁর চোখেও স্মৃতিচারণের উজ্জ্বল মদিরতা।

—আমারও মাঝে মাঝে মনে পড়ে, কি ভাবে বন্ধ বাসে স্কুলে গিয়ে আবার বন্ধ গাড়িতে বাড়ি ফিরে এসেছি। আর শাড়ি ধরবার দু বছর আগে থেকেই মায়ের চোখে মেয়ে পার করার ভাবনার ঘুম নেই দেখেছি।

—যাই হোক যে কোনো কারণেই আমাদের হোস্টেলে ও ধরনের বিয়ে প্রেম ছেলেদের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে তেমন কোনো উৎসাহ ছিল না। লাবণ্যের কথা বলছিলাম না? ও যে কি ভাবত চুপচাপ মুখে হাত চাপা দিয়ে কে জানে? আমরা বাইরে বেড়াতে বেরোলে বা ঘুমিয়ে থাকলে লাবণ্য ছাদে চলে যেত। যেদিকে ভিড় নেই, লাবণ্য সব সময় সেদিকে। মফঃস্বলের সেই হোস্টেলের বিশাল ছাদে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকত লাবণ্য।

আকাশের খুব ঠাণ্ডা, সদ্য রাত্রি ছুঁয়ে থাকা বুকে, মনে হ'ত সে মাথা রেখেছে। মাথা রেখেই সে বসে থাকত। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ছাদে ঝুঁকে পড়া নিমগাছের কষায় গন্ধে যেন তার বুকের ভিতর সমস্তটা নিকিয়ে পরিষ্কার হয়ে যেত হয়ত।

আর এত ভালো লাগত কেন জানেন? আকাশ বড় নির্লিপ্ত বলে। অতক্ষণ যে সে আকাশের বুকে মাথা রেখে, গালে হাত দিয়ে বসে আছে তাতেও কি নুয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখত তাকে? না দেখত না। লক্ষ্যই করত না। তাই তার এত ভালো লাগত। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত লাবণ্য। পাছে কেউ তাকে খুঁটিয়ে দেখে।

জানেন, স্কুলে যাবার সময় আমাদের মধ্যে বেশ একটা নিয়মই চালু হয়ে গিয়েছিল। যার যার প্রাণের বন্ধুকে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে গলা-জড়াজড়ি করে স্কুলে যাওয়া।

লাবণ্যকে কিন্তু আমরা কেউই ডাকতাম না।

লাবণ্য একা-একাই স্কুলে যেত।

ক্লাসে ছেঁড়া ময়লা ইউনিফর্ম পরার জন্য কতবার যে শাস্তি পেয়েছে লাবণ্য। তাতেও আমরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। লাবণ্য ত অসহ্য ছিল। তার দারিদ্র্য ছিল আরো অসহ্য। এখনও ভাবি সত্যি তখন যদি একটুকরো সাবান দিয়েও সাহায্য করতাম লাবণ্যকে। হয়ত অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা থেকে লাবণ্যকে বাঁচাতে পারতাম।

বিকেলবেলা লাবণ্য একা একা রুমালে বাদাম বেঁধে নিয়ে স্কুল-কম্পাউণ্ডের রাধাচূড়া গাছটার নীচে চলে যেত।

—সে ত আপনি যেতেন। আপনি একটু আগে বলছিলেন না?

গৃহকর্ত্রী হঠাৎ চমকে উঠলেন। তারপর সামলে বললেন,—আমিও যেতাম! যেতামই ত! লাবণ্যের সঙ্গে আলাপ হবার পর, লাবণ্যের খুব একটা বই

পড়ার অভ্যেস ছিল না। কিন্তু লাবণ্য নিয়মিত ডায়েরী লিখত। তার একটা কালো বাঁধানো খাতা ছিল। খাতাটা লাবণ্য সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখত। কাউকে দেখলেই লুকিয়ে ফেলত। কম্পাউণ্ডের মাঠ থেকে খেলা করে ফিরে আমরা দেখতাম লাবণ্য পড়তে বসেছে।

বইগুছোনো পরিপাটি টেবল্। মাটির একটা ফুলদানিতে লাবণ্য কিছু না কিছু উদ্ভিদ রাখতই। ফুল যদি না পেল ত, গাছের একটা পাতাসুদ্ধ ডালই সই। ভারি চমৎকার হাতের লেখা ছিল লাবণ্যর। মুক্তোর মত। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে ওর দিকে না তাকিয়েই পারতাম না। মুরে রেখাগুলি ভারি দুঃখী। অগোছালো কয়েকটা চুল সব সময়েই কপালে পড়ে। চোখ তুলে যখন চাইত তখন তার দু চোখে দৃষ্টি ছাড়াও এক ধরনের যন্ত্রণা নড়তে দেখেছি।

এর মধ্যে একটা মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে গেল। লাবণ্যর মাসীমা মারা গেলেন।

—লাবণ্যর মাসীমা ?

—আপনাকে বলিনি বুঝি, লাবণ্য তার মা-বাবার কাছে থাকত না। মা-বাবার ছিল মস্ত সংসার। অনেকগুলি ভাইবোন। লাবণ্যকে ওর মাসী পুষ্যি নিয়েছিলেন। লাবণ্যর মাসী কলকাতা করপোরেশনের টিচার ছিলেন। তিনি নিজের কাছে কেন যে লাবণ্যকে রাখতেন না আমরা তা অবশ্য জানি না। অবশ্য তিনি সামান্য কিছু জমা টাকা রেখে গিয়েছিলেন। জানা গেল লাবণ্যের ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ার খরচ তাতে উঠে যেতে পারে।

লাবণ্যের সঙ্গে হোস্টেলের অন্যান্য মেয়েদের অনেকখানি তফাৎ ছিল। তফাৎ, কারণ মেয়েদের মধ্যেই বিশেষ করে লক্ষ্য করে থাকবেন, বেশ ছোটবেলা থেকেই সাংসারিক জ্ঞান আর বাস্তববুদ্ধি অনেক বেশি দেখা যায়। তাই তারা ওকে দারুন তাচ্ছিল্য করত।

—কেন ? তাচ্ছিল্য কেন ?

—কারণ ওর ভিজিটার আসত না। দাঁতের মাজনের গুঁড়ো, সাবান, কালি এই সব ফুরিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে কিনতে পারত না। তার মাসিক বরাদ্দ সামান্য কটা টাকা আসত টিকিয়ে টিকিয়ে দেরি করে। লাবণ্য তার ছেঁড়া পেটিকোট, জীর্ণ শাড়ির ব্যাপারে অসম্ভব লজ্জায় পড়ত প্রায়ই। জানেন, একমাত্র তার খাতা বাঁধানো নয় বলে আমাদের ইংরেজির দোর্দণ্ডপ্রতাপ দিদিমণি তার খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

রাস্তায় কুকুর-বেড়ালের অসহায় বাচ্চাগুলোকে তিন-চারদিন গলায় শাড়ির

পাড়ের দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে বেড়ায় দেখেছেন নিশ্চয় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ? ওই ওদের অবোধ নিষ্ঠুরতা। কদিন বাদে বেশির ভাগ বাচ্চাগুলোকেই দেখা যায় ডাস্ট্‌বিনের ধারে অকালমৃত পড়ে আছে। এই নিষ্ঠুরতা কৈশোরে মাত্রাহীন থাকেই। ছোটবেলা স্কুলে কেউ শাস্তি পেলে, ফেল করলে, মাথা নেড়া হলে এমন কি শারীরিক ভাবে বিকলাঙ্গ হলে সহপাঠীরা ছাড়ে না। কৈশোর বড় নিষ্ঠুর।

—লাবণ্য বুঝি আপনাদের হোস্টেলের একমাত্র অসহায় কুকুরছানা ছিল ?

—প্রায় তাই। জানেন, লাবণ্য গরমের ছুটি পড়লে কি ভাবে বাক্স-বিছানা গুছিয়ে বাড়ি যায় আমরা দেখিনি। কি ভাবে ফেরে দেখিনি। কারণ আমরা যখন তাড়াহুড়ো করে সোরগোল তুলতে তুলতে বাক্স বিছানা গুছিয়ে বাড়ি যেতাম, লাবণ্য তখন নিরাসক্ত অন্যদিকের জানলার গরাদ ধরে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকত। লাবণ্য গরমের বা পূজোর ছুটিতে নিশ্চয়ই হোস্টেলে থাকত না। হয়ত বাড়ি যেত কিংবা মাসীর বাড়ি, তাকে কেউ নিতে আসত কিনা আমরা কোনেদিন দেখিনি। আবার ছুটির শেষে কখন সে ফিরে আসত তাও আমরা জানতে পারতাম না। কারণ আমরা এসে দেখতাম সে যথারীতি টেবিল সাজিয়ে বিছানা পেতে বসে আছে।

ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখের।

—তা ত বটেই। কিন্তু জানেন, আমরা তা নিয়েও হেসেছি। কতদিন আমরা খালি খামে যা-তা হিজিবিজি লিখে লাবণ্যকে চম্‌কে দিয়েছি। লাবণ্য, লাবণ্য তোমার চিঠি এসেছে, দেখো! আগ্রহে খামটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিয়েছে। ছিঁড়ে ভিতরের কাগজটা বের করে যতক্ষণ ভাঁজ খুলেছে আমরা ওঁৎ-পাতা-বনবেড়ালের মত সেদিকে তাকিয়ে থেকেছি। তারপর দুঃখে অপমানে হতাশায় যখন তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, তখন আমরা হাসতে হাসতে লাল গরম হয়ে উঠেছি।

তবু জানেন, শেষ পর্যন্ত লাবণ্য আমার বন্ধু হয়ে গেল।

লাবণ্য এখনো আমার বন্ধু আছে।

গৃহকর্ত্রী মুখ তুলে তাকালেন। দৃষ্টি দীর্ঘ করে ফেললেন পাঁচিলের কাছে ভিড় করে থাকা গাছগুলোয়। শীতের খানিকটা নেমে আসা সূর্য গাছের ছায়াগুলোকে লম্বা করে দিয়েছে। সার সার আচারের জারগুলো এ বছরে রোদের সমস্ত উত্তেজকে নিজেদের মধ্যে জমিয়ে জমিয়ে ও বছরের জন্যে

হাড়েমাংসে জারিত হচ্ছে। পুরোনো রোদের আস্বাদ, পুরোনো স্মৃতির আস্বাদ। মহিলার দু চোখে দু ফোঁটা আলোকবিন্দু ঝিল্‌মিল করে উঠল।

—আচ্ছা আপনার কি খুব ভাল্ লাগছে ?

—কি ?

—লাবণ্যের গল্প !

—না ত। বরং মনে হচ্ছে, এখনো কিছু শোনাই হ'ল না প্রায় !

—হ্যাঁ, এ ত প্রায় ধান ভানতে শিবের গীতের মত।

উপন্যাসের প্রক্ষিপ্ত অংশ। আজ আপনাকে যে গল্প বলব তাতে এই কৈশোর কাহিনীর খুব একটা প্রয়োজন যে ছিল তা নয়।

লাবণ্য একটা অকিঞ্চিৎকর মেয়ে। অত্যন্ত সাধারণ। আলোচনার বিষয়-বস্তুও না। এমন কি তার তেমন কোনো দুর্নাম তৈরী করার মতও ক্ষমতা ছিল না যে ক্রমওয়েলের মত, কেউ না কেউ ঘৃণা ভরে তার কবর খুঁড়বে। লাবণ্যের জীবনের কথা কেউ কোনোদিন শুনতে চাইবে না। কেউ সাধারণ মেয়েদের জানতেও চায় না। মানুষ যখন হঠাৎ খুব নাম করে ফেলে তখন তার বাবা মা প্রতিবেশীরা ভেবে ভেবে বের করে সে শৈশবে কি কি করিৎকর্ম করেছিল। লাবণ্যর ভাগ্য ভালো যে তার মত একটা সাধারণ মেয়ের দারুণ সাধারণ কৈশোরকে আমরা ফিরে পড়ছি। লাবণ্যকে আমরা ভাগ্যবঞ্চিত করব না। কি বলেন ?

—নিশ্চয় না। আপনি বলুন। আপনার বর্ণনামত লাবণ্যকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। রোগা রোগা দুঃখীমত, একটু কালো প্রতিমামুখী একটা মেয়ে। একঢাল চুল, শাদা ব্লাউজ, ময়লা-ময়লা মাড়ছাড়া শাড়ি পরা।

—আপনি ঠিক বলেছেন। লাবণ্য ঠিক অমনিই ছিল।

বড় একলা, বিষণ্ণ। চুপচাপ।

তারপর জানেন আমাদের হোস্টেলে একটি নতুন মেয়ে এল। ইন্দ্রাণী মজুমদার। ইন্দ্রাণী মস্ত বড় মানুষের মেয়ে। কলকাতায় ওদের পাকাপাকি আস্তানা। তবু কেন যে মেয়েকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল আমরা বুঝতে পারিনি। ইন্দ্রাণী এসেই দারুন চেঁচামেচি শুরু করে দিল। তার জানলার ধার চাই, বারান্দার কাছাকাছি চাই, এইসব।

আমরা সব ইন্দ্রাণীর মহিমায় মুগ্ধ। ওর একটা আগাগোড়া নরম চামড়ায় মোড়া লালটুকটুকে ট্রাংক ছিল। নতুন ঝক্‌ঝকে তোষকে বালিশে

সুন্দর বিছানা ছিল। ওর বাবা মা সপ্তাহে অন্তত তিনখানা চিঠি লিখতেন। সপ্তাহে একদিন ওর জন্যে কিছু না কিছু খাবারদাবার ওভালটিন হরলিক্‌স পাঠাতেনই ওর মা বাবা। আচার, ঘি, মাখন বিস্কিটে ওর কাবার্ড সব সময় ভর্তিই থাকত। ওর লেখার খাতাও আসত কলকাতা থেকে। ভারে ভারে। রামধনু রঙের মার্বেল কাগজের বাঁধানো ঝক্‌ঝকে খাতা। তার জ্যামিতির বাক্স বিলেত থেকে তার মেজদা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাত্রে শোবার আগে সে গোলাপী স্লিপিং ড্রেস পরত। তার টেবল্ ল্যাম্পে একটা অদ্ভুত ঝক্‌ঝকে ডানাওলা পেতলের পরী ছিল।

আমরা সেইজন্য ইন্দ্রাণীর কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসতাম। সেই সময় আমার বাবা বম্বে থেকে একটা ভারি সুন্দর ফাউন্‌টেন্‌পেন্ এনে দিয়েছিলেন। ছোটবেলার ব্যাপার। অমন রূপবান ঝর্ণা কলম পেয়ে আমি যে কি ডগমগ হয়েছিলাম সে আর আপনাকে কি বলব ? পড়ার সময় রোজ টেবিলে রেখে হাঁ ক'রে চেয়েই থাকতাম সেটার দিকে। মাদার অফ্ পার্লের মত তার শাদা শরীর থেকে ঘোরালে ফেরালে হাল্‌কা হালকা সাতটা রঙের আভা বেরোত। মনে আছে, যেদিন বাবা কলমটা এনে দিলেন আমি হোস্টেলের সব মেয়েকে দিয়ে নাম লিখিয়েছিলাম একটা কাগজে।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বীণাদিও বাদ পড়েন নি।

লাবণ্যও না।

তিনদিনের মাথায় সেই কলমটা আমার হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল বলতে পারব না। কারণ আমি যেভাবে সন্তর্পণে সোনালী বাক্সের মধ্যে ভেলভেটের বিছানায় শুইয়ে রাখতাম তাতে তাকে অবহেলায় হারানোর কোনো ফাঁকই ছিল না।

বোঝা গেল কলমটা সত্যি কথা বলতে কি কেউ চুরি করেছে।

আমি ত নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়লাম। মেয়েরা বীণাদির কাছে সব কথা জানাল।

বীণাদি নিজে এসে আমাদের সব কটি বোর্ডারকে জড়ো করলেন। ছোট বড় মেয়ে মিলিয়ে আমরা ছিলাম ছত্রিশ জন। কিন্তু বীণাদির চোখ ঘুরে ঘুরে গিয়ে পড়ল ঠিক লাবণ্যর মুখের ওপর। তিনি বললেন,—দেখো, এ ধরণের ব্যাপার এ হোস্টেলে কখনো ঘটেনি। অনেকেই বলেছে কাল রাতে কলমের বাক্সে ওকে যত্ন করে কলম ভরে রাখতে দেখেছে তারা, সুতরাং

কলমটা কোথাও হারিয়ে গেছে বা পড়ে গেছে এ কথাটা কিছুতেই বলা যায় না। আমি ভালো কথায় বলছি যে কলমটা নিয়েছে সে কাল সকালের মধ্যেই আমার ঘরে জমা দিয়ে এলে আমি ব্যাপারটা কাউকে বলব না। কিন্তু কালকের মধ্যে যদি কলম না পাওয়া যায় তাহলে আমি কলম কেউ গিলে ফেললেও চোরের পেট থেকে টেনে বের করব। আর তাকে সব রকমে অপদস্থ করব।

আমরা সবাই দুরু দুরু বুকে পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম।

বীণাদির কিশোর মনস্তত্ত্ব বিদ্যা নিয়ে বড়াই করার ফল কিন্তু শূন্য হ'ল। তিনি ফলে আরো আগুন হয়ে উঠলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, প্রতিটি ঘর সার্চ করা হবে। দু'জন জবরদস্ত শিক্ষয়িত্রীকে নিয়ে তিনি প্রথমেই আমাদের হলঘরটিতে ঢুকলেন।

আমরা সার বেঁধে দাঁড়ালাম। ইন্দ্রাণী আমার কানে কানে বলল,—তোমার পাশের খাটে যিনি থাকেন, তাঁকে কিন্তু আমি ঘুর ঘুর করতে দেখেছি তোমার টেবিলে।

আমি বললাম,—হ্যাঁ, কদিন ধরে ও আমার টেবিলে বসত, কারণ কদিন ধরে টেবিলে চাঁপা ফুল রাখছি কিনা, ও চাঁপার গন্ধ ভালোবাসে বলে আসত।

রত্না আবার বলল,—জানিস না, চাঁপার গন্ধে সাপ আসে, কালসাপ! সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে আজ বলি, আমিও মনে মনে লাবণ্যকেই সন্দেহ করেছিলাম। মুখে কিছু বলছিলাম না। তবে আমি কখনো চাইনি যে সকলের সামনে লাবণ্য অপমানিত হোক।

বীণাদি সোজাসুজি লাবণ্যর কাছে গিয়ে তার সরু সরু দু কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন,—কলমটা বের করে দাও লাবণ্য -

লাবণ্য একটা কথাও বলতে পারল না। বীণাদিকে আমরা সবাই যমের মত ভয় করতাম। সাধারণ কথাবার্তা জিজ্ঞেস করলেই ভয় পেয়ে থতিয়ে যেতাম। তায় এইভাবে মারমুখী হয়ে কথা বলা।

লাবণ্য কিছু বলছে না দেখে বীণাদি আরো রেগে গেলেন।

—ভালোয় ভালোয় দিয়ে দাও লাবণ্য, না হ'লে তোমার বাক্স-বিছানা সব খুলে দেখা হবে। তুমি এমনিই ডিফলটার, তিনমাস তোমার টাকা আসেনি, তার ওপর সবাই তোমাকেই সন্দেহ করছে।

লাবণ্য কিছু বলতেই পারল না। বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়েই রইল। তার মুখের কোনো রেখাও পাল্টাল না, বোধ হয় ভয়ে অপমানে তার

সে ক্ষমতাটুকুও চলে গিয়েছিল।

তারপর আমরা দেখলাম লাবণ্যর বাক্স-বিছানা খোলা হচ্ছে, জিনিসপত্র তছনছ করে ফেলা হচ্ছে। বালিশ তুলে, তোষক ফেলে একেবারে বিশ্রী ব্যাপার।

আপনার খুব দীর্ঘ লাগছে, না? লাবণ্যের গল্পটা?

—না, খুব দারুণ লাগছে। প্রায় ডিটেকটিভ গল্পের মত।

তবে শেষটা কিন্তু আমি প্রায় ধরে ফেলেছি।

গৃহকর্ত্রী চকিত তাকালেন, অজান্তেই তাঁর হাত জলের গ্লাসের দিকে এগোচ্ছে,—শেষটা, আপনি ধরে ফেলেছেন বলছেন?

—আচ্ছা পেন্‌টা ইন্দ্রাণী কি চুরি করেছিল?

—আশ্চর্য! যে কথা এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকলজির ছাত্রী বীণাদি ধরতে পারেননি সে কথা—

—আমি জানি যে, যাকে যা মনে হয় সব সময় তাই হয় না।

—ইন্দ্রাণীর স্যুটকেসে শুধু আমার পেন কেন, হোস্টেলের অনেক মেয়ের অনেক ছোটখাটো শখের জিনিসই বেরিয়ে পড়ল।

বীণাদি পরে বলেছিলেন, ও নাকি অভাব চোর নয়, স্বভাব চোর!

আরো শোনা গেল, ওর ক্লেপ্টোম্যানিয়া সারানোর জন্যই ডাক্তারের পরামর্শে ওর বাবা-মা ওকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়া একটু হাসলেন।

—বড়লোকের মেয়েরা চোর হলে ঐ রকম সব রোগের নাম করার একটা নিয়ম আছে বটে।

—কিন্তু জানেন, ব্যাপারটা লাবণ্যর পক্ষে কিছুটা ভালোই হ'ল। কারণ সেই থেকেই লাবণ্য আমার খুব বন্ধু হয়ে গেল।

প্রথমা একটু থেমে চেয়ারের পিঠে নিজের ক্ষীণ শরীরটা সামান্য এলিয়ে দিলেন। তাঁর চোখদুটি তারার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অনেকদিন বাদে একসঙ্গে অনেক কথা ভিতর থেকে বের করে দিতে পারলে, কথাপ্রসঙ্গে ফিরে মনে করতে পারলে হয়ত এমনি আনন্দ হয়।

—বরং লাবণ্যের কৈশোরোপাখ্যান থাক। আপনার হয়ত সময় নষ্ট হচ্ছে। আশ্চর্য, রাখাল এখনো আমাদের জন্য কফি আনছে না কেন? ও কি বাড়িতে নেই? না ঘুমিয়েই পড়ল?

দ্বিতীয়া বললেন,—কিন্তু লাবণ্যর প্রতিক্রিয়ার কথা ত বলবেন। অন্তত দু'চার কথায়।

—দাঁড়ান আগে রাখালকে কফির কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে আসি।

প্রথমা উঠলেন। শীর্ণ ঈষৎ ন্যুব্জ শরীর। হেঁটে বারান্দার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেলেন। মনে হ'ল হাঁটতে তাঁর বেশ আয়াস হয়। সিঁড়ির কাছে গিয়ে তিনি অপেক্ষমাণ খানসামাকে মৃদু তর্জন করলেন। তারপর ফিরে এসে বসলেন নিজের চেয়ারে।

—হ্যাঁ, সে রাত্রে লাবণ্য মনে মনে ভেঙে একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। সবাই যখন তার কাছে ক্ষমা চাইছিল, দুঃখ প্রকাশ করছিল তখন লাবণ্য কোনোদিকেই তাকায়নি। শোনেনি। ইন্দ্রাণী হোস্টেল থেকে যখন চলে গেল তখন যাবার আগে লাবণ্যের কাছে একবার এসেছিল। লাবণ্য কিন্তু কিছুতেই তার দিকে মুখ ফেরায়নি। ভালো করে কথা বলেনি।

রাত্রে সকলেই যখন শুয়ে পড়ল তখন আমি হাতড়ে হাতড়ে গেলাম লাবণ্যর বিছানায়। আস্তে আস্তে তার পাশে শুয়ে পড়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম,—লাবণ্য, আমায় ক্ষমা করো, আমি সব বুঝেছি!

—আপনারা কত সালে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন?

—কেন? হঠাৎ?

—বোধ হয় সে সময়েই আমরাও কলেজে-টলেজে ঢুকছি—

—আপনি কলেজ পর্যন্ত এগিয়েছিলেন?

—ছিলাম, কিন্তু পাস করতে পারিনি। তার আগেই বিয়ে হয়ে গেল।

—ম্যাট্রিক পাস করার পর আমাদের বেশ কিছুদিন আর দেখা হয়নি। লাবণ্যের কাছে পরে যা শুনেছি, তাই থেকে বলি,—ম্যাট্রিক পাস করবার পর লাবণ্য কলকাতায় ওর বাবা-মায়ের কাছে থাকতে এল।

—সে বাড়ি সে পরিবেশ আমি দেখেছি।

উত্তর কলকাতার গলির মধ্যে যতদূর মনে পড়ে একটা টাল-খাওয়া গ্যাসপোস্টের ধারে তার বাড়িটা। ভিতরে মাটিতে বসে-যাওয়া চটাওঠা গোটা দুই ঘর। খুব নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ি যা যা দেখা যায় সব। খিট্‌খিটে স্বামী-স্ত্রী, কাচ্চাবাচ্চা, তক্তপোষ, মালিশের শিশি। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার পর লাবণ্যর সঙ্গে এক-আধবার দেখা হয়েছিল। তারপর খবর পেলাম লাবণ্য বেথুনে ভর্তি হয়েছে। লাবণ্য যে আদৌ কলেজে পড়তে পারবে

তা আমি আশাই করতে পারিনি। কারণ জানতাম মাসির জমানো টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে। আর ওর বাবা-মায়ের আর মেয়েকে কলেজে পড়ানোর সাধ্য নেই।

তাই, সত্যি কথা বলতে কি, লাবণ্য বেথুনে ভর্তি হয়েছে শুনে, আমি খানিকটা অবাকই হলাম। আমিও কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু বেথুনে নয়, স্কটিশে। লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ ছিল না। বেশ কয়েক মাস পরে একদিন মহম্মদই পর্বতের কাছে হাজির। কমনরুমে ঢুকতেই বন্ধুরা বলল, —এই দেখ, তোমার জন্য এক পিরিয়ড ধরে অপেক্ষা করছে মেয়েটি।

আমি চিনতে পারিনি। লাবণ্য কি? আমার ত মেয়েটিকে লাবণ্য বলে চিনতেই দেরি হ'ল।

লাবণ্যের একটুও শরীর ফেরেনি। তেমনি ছিপছিপে হালকা চেহারা আছে। কিন্তু তার মধ্যে সব চেয়ে সুচারু সংহত যৌবন এসেছে। লাবণ্যকে কি ঠিক সেইজন্যই চিনতে পারিনি? না, তাও বোধ হয় নয়। তার পোশাকেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। লাবণ্যকে ঠিক ওই পোশাকের মোড়কে দেখতে পাবো আমি ঠিক এমনটি কখনো ভাবিনি।

লাবণ্যের পরনে চমৎকার শ্যাওলা রঙের ঢাকাই শাড়ি, আদ্দির লেশ বসানো ব্লাউজ। লাবণ্য গলায় সোনার মফ্‌চেন পরেছিল। তারও মূল্য কম নয়।

সেদিন লাবণ্যকে সঙ্গে রেখে দিলাম। তারপর জোর করে আমাদের বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলাম।

লাবণ্য বাবা-মায়ের সংসার ছেড়ে এখন এক দাদার বাড়ি আশ্রিত। তাকে তার বাবা-মা এক ধনী অসুস্থা বৌদির কাছে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

—বুঝলি, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মেয়েদের কিভাবে নিজেদের অধিকার বিস্তার করতে হয়, দাঁড়াবার জমি তৈরী করতে হয়, তার হাতেখড়ি বিয়ের আগেই হয়ে গেল। এরা যদি আবার তাড়িয়ে দেয়, তাহ'লে আবার কোথায় কার বাড়ি গিয়ে এই কাজ আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে কে জানে।

বলতে বলতে অদ্ভুত বিষাদে হেসে উঠেছিল লাবণ্য।

দ্বিতীয়া হেসে বললেন,—অবশ্য আপনার বর্ণনা শুনেই বোঝা গেছে যে দাদার বাড়ি আপনার লাবণ্য নিজের অধিকার বেশ ভালোভাবেই কায়েম করতে পেরেছিল। না হ'লে ঢাকাই শাড়ি, আদ্দির ব্লাউজ, সোনার মফচেন—

—হ্যাঁ, সে ত নিশ্চয়ই। লাবণ্যর বৌদি প্যারালিসিসে একদম শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। তাকে দাদার মস্ত সংসার লোকজন কর্মচারী সব দেখতে হ'ত। ওর ওই সম্পর্কিত দাদার মস্ত ব্যবসা ছিল। বাড়িতে অনেক আশ্রিত পরিজন ছিল। জানেন, আমি সে বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি। বাড়িটি ভারি সুন্দর। এখনও যেন বাড়িটির ছবি আমার চোখের সামনে ভাসে। মস্ত বাগানওয়ালা গোলাপী রঙের বাড়ি। তিনতলা, উঁচু। বাড়িটায় কত ঘর। ঘরে ঘরে কত আসবাব, ছবি, কার্পেট। সে বাড়িতে লাবণ্যকে অবশ্য হেঁসেলও ঠেলতে হ'ত না কিম্বা ন্যাতা বুলোতে হ'ত না বটে, কিন্তু দরজার পেতলের নবগুলো ব্রাসো দিয়ে সোনার মত ঝক্‌ঝকে হয়েছে কিনা, আলোর বাল্বের গায়ে পাৎলা ধুলোর আস্তর পড়েছে কিনা, ডাইং ক্লিনিং থেকে দাদার শার্ট স্যুটের গোছাগুলো ঠিকঠাক আসছে কিনা এসব লাবণ্যকে দেখতে হ'ত। তাছাড়া প্রতিদিনের নতুন নতুন রান্নার মেনু করা, বৌদিকে ফিজিক্যালি ও সাইকলজিক্যালি এ্যাটেণ্ড করাও লাবণ্যর কাজ ছিল।

লাবণ্যের তখনকার জীবনের কথা শুনে আমি কিন্তু সত্যিই খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম।

মেয়েটা বড় দুঃখী। যাই হোক, অভাবেও নেই। অন্ততঃ দুবেলা খাওয়া জুটছে। পড়াশুনোর সুযোগ মিলছে।

কিন্তু জানেন, তা ছাড়াও আরো একটা ব্যাপার কিন্তু আমার চোখ এড়ায়নি। আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, কোনো না কোনো কারণে লাবণ্য নির্ঘাৎ সুখে আছে। মেয়েরা সুখে থাকলে কি করে বোঝা যায় বলুন ত ?

—তখনকার তারা অন্যের কথা আর শুনতে চায় না, জানতেও চায় না। খুব সরল হলে গলগল করে কেবলই নিজের সুখের কথা বলে যায়। বলে বলে লোককে বোর করে। আর চাপা হলে সুখকে ভিতরে জমিয়ে জমিয়ে একা চোখে হাত চাপা দিয়ে চুপচাপ শুয়ে তার আস্বাদ গ্রহণ করে।

—সত্যিই তাই। আপনি ঠিক বুঝেছেন। লাবণ্য তার সুখের কথা আমাকে বলেনি। সে যে চাপা বলে আমায় বলেনি ঘটনাটা ঠিক তা কিন্তু নয়। আসলে, জানেন, আসলে সে হয়ত বুঝতেই পারেনি তার সুখ আসলে কি থেকে উঠে আসছে। কোন্ বিষয় থেকে।

কিন্তু আমি ভুল দেখিনি। তার চোখের সেই দু'কোঁটা টলমলে আলো।

সেই আলোর তরলবিন্দুর ঘোরাঘুরি। কিছু পেলে মানুষের চেহারার মধ্যে একটা নির্ভরতা আসে। অদ্ভুত শান্ত একটা ঋজুতা। লাবণ্যের মধ্যে তা এসেছিল। লাবণ্য অনেক বেশি কথা বলছিল। অনেক বিষয়েও কথা বলছিল। এমন কি প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয়েও। আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম।

সকাল থেকে লাবণ্যকে কত কত কাজ করতে হয়।

অজয়দা নাকি তার তৈরী করা পুডিং দারুন পছন্দ করে। অজয়দা তার দেওয়া স্যুট্ ছাড়া পরেই না। অজয়দা অফিস থেকে ফিরে এসে তার হাতের কফি ছাড়া খায় না। সন্ধ্যেবেলা সে আর অজয়দা বৌদিকে কবিতা আবৃত্তি করে, গান গেয়ে শোনায়।

আমি হাঁ করে লাবণ্যের মুখের দিকে তাকিয়ে কেবল শুনেই যাচ্ছিলাম।

লাবণ্য চলে যাবার আগে আমাকে অনেক করে তার অজয়দার বাড়ি নিমন্ত্রণ করে গেল। আমিও কথা দিলাম, খুব তাড়াতাড়ি একদিন লাবণ্যদের ওখান থেকে ঘুরে আসব।

লাবণ্য চলে যাবার পরও আমি লাবণ্যের কথা ভাবছিলাম।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে উঠল।

আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' পড়েছেন আপনি? দুই বোন?

দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি বাবা মা ভাই বোন ছাড়া তখনো যদি আর কারো জন্য মনে জায়গা থাকে, তবে তা লাবণ্যর জন্যই ছিল। লাবণ্যের মধ্যে যে আকর্ষণ শক্তি আছে তা যে কত প্রচণ্ড হতে পারে, আমারও তখন তার মত বয়সে জানতে বাকি ছিল না। আমি ঠিক করলাম নিজে গিয়ে ব্যাপারটা জরীপ করে আসব।

আমার কেমন যেন মনে হ'ল, অজয়দার প্রতি লাবণ্যর ভীষণ আসক্তি আসছে।

সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে কাছ থেকে লক্ষ্য করবার জন্য আমি একদিন লাবণ্যর অজয়দার বাড়িতে নিজেই চলে গেলাম।

আমি যেদিন গেলাম সেদিন আগে থাকতেই খবর দিয়ে রেখেছিলাম। লাবণ্য আমার জন্য গেটের কাছে নিজে দাঁড়িয়েছিল।

সুন্দর বাগান পেরিয়ে গাড়িবারান্দায় এলাম। লাবণ্যের অজয়দার একাধিক গাড়ি আমার চোখ এড়াল না।

লাবণ্য আমাকে ড্রইংরুমে বসাতে গেল। আমি কিন্তু সময় নষ্ট করতে রাজী ছিলাম না। আমি তার বৌদিকে দেখতে চাইলাম। লাবণ্য আমাকে তিনতলায় নিয়ে গেল।

বৌদির ঘর বিরাট হলঘরের মত। বিছানায় লেসের ঢাকনি দেওয়া। পাশে ত্রিপয়ে বাগান থেকে তোলা একগুচ্ছ টাট্‌কা গোলাপ। লাবণ্যর বৌদি সেই বিছানায় শুয়েছিলেন।

জানেন ঘরে ঢুকেই আমার কেমন চমক লাগল। যেন রবীন্দ্রনাথের মালঞ্চ নাটকেব একটা দৃশ্যে ঢুকে পড়েছি। লাবণ্যের বৌদিকে ঠিক নীরজা মনে হয়েছিল আমার। সেই অদ্ভুত অতৃপ্ত অস্থির চোখ, কথা বলছেন অনর্গল, কিন্তু কথার ভিতরে মন নেই। চোখদুটি অস্থির পতঙ্গের মত। যেদিকে লাবণ্য সেদিকে। বোধ হয় এমনিই হয়।

একরকম পরিবেশ, রোগ, শরীরের অকেজো যৌবন সব রুগীকে একটা ছাঁচে ঢেলে দেয়।

বৌদির সঙ্গে কথা বলতেই হঠাৎ নীচে গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ পেয়ে গেল লাবণ্য।

লাবণ্য অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়াল।

—অজয়দা এলেন বোধ হয়। আমি যাই। তুমি বৌদির সঙ্গে গল্প করো।

লাবণ্যর পঁয়ত্রিশ বছরের প্যারালিটিক বৌদির সামনের চেয়ারে বসে এমন কতকগুলি কথা শুনে যেতে হ'ল যা এইসব পরিবেশে বলতে এবং শুনতে হয়। এই-ই নিয়ম।

যেমন আমার বাবা-মা সম্বন্ধে বৌদির আগ্রহ প্রকাশ।

আমারও বৌদির অসুখ সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া।

লাবণ্য কত ভালো মেয়ে, বৌদির কত সেবাযত্ন করে, তার সেবাযত্নে বৌদি কত উপকৃত।

আমার কতদূর পড়াশোনা করার ইচ্ছে, বিয়ের খোঁজখবর হচ্ছে কি না ইত্যাদি।

তারপর সারা ঘর বদলে গেল অসিত ঢুকতেই।

—লাবণ্য কোথায় সেজদি?

—জানি না।

বিরক্ত কণ্ঠে বৌদি বললেন। তারপর অবশ্য কণ্ঠস্বর বদলে ফেলে বললেন,

—এই আমার ভাই, অসিত। বি. এ পাস করে এম. এ. পড়ছে। ইকনমিক্সে। বাবা পরে বিলেত পাঠাবেন।

অসিত আমার দিকে তাকালো। সুপুরুষ তরুণ। ভারি উজ্জ্বল দুটি কৌতূহলী চোখ।

—ওঃ, আপনিই লাবণ্যর সেই প্রাণের রুবি !

দ্বিতীয়া প্রথমার মুখের দিকে উজ্জ্বল চোখ দুটি ফেরালেন।

—যাক, এতদিনে তবু আপনার নামটা জানা গেল। মিসেস মিত্র করে করে আর কতদিন ডাকা যায়, ভাবা যায়? আপনার নাম তাহলে রুবি ?

—না, না, করবী ! করবী বসু ছিলাম।

—করবী বসু ! না ? আচ্ছা, আপনার নাম কি আমি আগে শুনেছি ? না শুনিনি বোধ হয়। শুনিই নি। ভুল করছি। আপনি বরং অসিতের কথা বলুন।

—অসিতের কথা !

গৃহকর্ত্রীর স্তিমিত চোখ দুটি মধুর স্মৃতিময়তায় ঝিলমিল করে উঠল। তিনি যেন অতীতের ছবির এ্যালবাম খুলে অসিতের ছবিগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন।

—অসিত, অসিত বড় রূপবান ছিল। বড় সুন্দর। তার সম্বন্ধে অনেক অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। বলতে আরম্ভ করলে গল্পটা একটু বড় হয়ে যাবে, এত বেশি বলতে ইচ্ছে করছে। তার চেহারায় রূপে আভিজাত্য সংস্কৃতি আর পৌরুষের একটা সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। আর সব চেয়ে আকর্ষণীয় ছিল সে তার সরলতার জন্য।

—আপনার কথা লাবণ্যর কাছে কত শুনেছি !

আমি কিন্তু কেমন করে যেন বুঝতে পারছিলাম অসিত ছেঁদো কথা বলছিল। মনে মন ছিল না। মন তার অন্য কোথাও। বলতে হয় বলে বলা। ঘর খুলে দিতে না পারলে রকে বসানো। এমনি একটা ব্যাপার।

—লাবণ্য কোথায় ?

—তোর জামাইবাবুকে বোধ হয় খেতে দিচ্ছে।

অসিত অকস্মাৎ আমাকে বলল,—আসুন না, আমরা বারান্দায় বসি।

আমি বুঝতে পারলাম ঠিক আমার সঙ্গে বসবার জন্যে অসিত আমাকে

বারান্দায় ডাকছে না। তার অন্য উদ্দেশ্য আছে। আমি বৌদির কাছ থেকে খানিকক্ষণের জন্য বিদায় চেয়ে নিয়ে অসিতের সঙ্গে বারান্দায় বসলাম।

—তারপর, আপনি কী সাবজেকট্ নিয়ে পড়ছেন বলুন!

আমি উত্তর দিচ্ছিলাম। কিন্তু মনে মনে হাসি পাচ্ছিল।

বোগেনভোলিয়ার প্রস্ফুটিত ঝাড়, রট্ আয়রণের অসম্ভব সুন্দর টেবল্ চেয়ার, সন্ধ্যার মনোরম আলো, আমার তখন যা বয়স বা সৌন্দর্য তখন এইসব বলে কথা আরম্ভ ছেলেরা অবশ্যই করে, কিন্তু তাদের চোখে যে উপাসনা থাকে, তা কিন্তু অসিতের চোখে ছিল না। সে ভালো করে আমার কথা না শুনেই উঠে দাঁড়াল।

—এক কাজ করি, বরং লাবণ্যকে ধরে আনি, কি বলেন?

অসিত দ্রুত চলে গেল।

খানিকক্ষণ একা একা বসে থাকার পর, হাতের কাছে কোনো কিছু করবার না পেয়ে আমি উঠে লম্বা টানা পোর্টিকোতে সাজানো ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। ছবি দেখতে দেখতে কখন যে সিঁড়ির মুখে চলে গেছি খেয়াল নেই।

তখনই হঠাৎ কথাবার্তার ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ শুনে আমি সিঁড়ির মুখে ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, সিঁড়ির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে অসিত আর লাবণ্য ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছে।

অসিত আর লাবণ্য।

লাবণ্যর মুখটা একটু উপর দিকে তোলা। অসিতের ঈষৎ নামানো। কিছুক্ষণ বাদে লাবণ্যর হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিল অসিত। তারপরে দুজনে একসঙ্গে ওপরে উঠে এল।

অবশ্য উঠে এসে দেখতে পেল, আমি সুবোধ বালিকার মত ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি পড়ছি।

লাবণ্য এসে বসবার পর পরিবেশটা খুব সহজ হয়ে এল। অসিত খুব স্বচ্ছন্দ হয়ে কথাবার্তা বলতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে অজয়দা ওপরে এলেন। অজয়দার শরীর একেবারে খেলোয়াড়দের মত। পেটা, পুরো ফিট্। ভদ্রলোক ব্যবসায়ী না হয়ে চিত্রতারকা হ'লে দিব্যি মানাত। ওই যে সিনেমার শেলের চশমা ডেসিংগাউন পরা ব্যাক্‌ব্রাশ চুল একরকম হীরো থাকে না?

আমরা সবাই মিলে বৌদির ঘরে গেলাম। ওখানেই চা খাওয়া হ'ল। তার

পর বৌদিকে খুশি করবার জন্য অজয়দা আর অসিত নানারকম হাল্কা আলোচনা, ক্যারিকেচার কত কি যে শুরু করল! আমরা প্রাণখুলে প্রচুর হাসলাম। এই সব যা হয়! তারপর সহজ হাল্‌কা মনে বিদায় নিলাম্।

ফেরার সময় আমার মনটা খুব হাল্কা হয়ে গেল।

সন্ধ্যাটা এসেছিল অসম্ভব একটা চাপা, গভীর, অসামাজিক গোপন কথার পিঠে চেপে। যার গোপন কথার বোর্‌খার তলায় একেবারে অসহায় একটা বয়সোচিত ভালোবাসার ঘটনা মাত্র চাপা রয়েছে। মনে মনে ভাবলাম্ অসিতের সঙ্গে লাবণ্যকে চমৎকার মানাবে। লাবণ্য বেচারী জীবনে প্রায় কিছুই পায়নি। লাবণ্য এবার বুঝি সুখের মুখ দেখতে চলেছে।

—জানেন, তারপর লাবণ্য আর অসিতকে আমি অনেকবার দেখেছি। আমাদের গাড়ি যখন বেথুন কলেজের সামনে দিয়ে দক্ষিণের দিকে মোড় নিত, প্রায়ই দেখতাম অসিত বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রাম, বাস, মানুষ, কলেজের সুবেশিনী অল্পবয়সী মেয়েদের দিকে তার কোনো দৃষ্টিই নেই। একাগ্র লক্ষ্যভেদ শুধু বেথুন কলেজের দিকে। অসিত আর লাবণ্যকে যখনি একসঙ্গে হাঁটতে দেখেছি তখনও তারা দুজনে এতই নিমগ্ন যে কখনো এত বড গাড়ি নিয়ে পাশ দিয়ে যেতে যেতেও আমি ওদের লক্ষ্যগোচর হতে পারিনি।

একটু ক্লিষ্ট, একটু চিন্তিত, কিন্তু সুখী দুটো মুখ। অনর্গল সংলাপ। তবে সত্যি কথা বলতে কি, লাবণ্যের ওপর আমি একটু চটেও গিয়েছিলাম। প্রথম যেদিন দেখা হ'ল, ও সকলের কথা আমাকে বলেছিল। ওর অজয়দার কথা, বৌদির কথা, মা বাবার কথা, কিন্তু কৈ অসিতের কথা ত একদম বলেনি।

—অনেকে এমন হয়। আমিও দেখেছি। নিজের অজান্তেই জানে কোন্ কথা বলতে হবে, কিংবা কোন্ কথা চাপতে হবে।

—হ'তে পারে! সত্যি, জানেন, লাবণ্য সে-সময়টা একদিনও আমাদের বাড়ি আসেনি। কিম্বা আমার সঙ্গে দেখা করেনি। সত্যি আসা যায় না। ভালোবাসা প্রথম দিকে প্রায় সন্দেহবাতিকগ্রস্ত বউ-এর মত হিংসুটে। এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়তে চায় না। তখন আর সবই মিথ্যে হয়ে যায়। লাবণ্য ডাকেনি, তবু আমি নিজেই একদিন লাবণ্যদের বাড়িতে চলে গেলাম। লাবণ্য রান্নাঘরে তদারকি করছিল। আমাকে দেখে খুব খুশি। হেসে বলল,

—তুই ওপরে বৌদির কাছে গিয়ে বোস, এখানে গরমে কষ্ট হবে।

আমি কিন্তু ওর সঙ্গে সঙ্গেই রইলাম। লাবণ্যকে কাজ করতে দেখারও একটা সুন্দর সুখ আছে। ওর বাহু, কটি, চলার ভঙ্গির মধ্যে তেল দেওয়া মেশিনের মত একটা অবলীলা ছিল।

—অসিতের কি খবর ?

আমি আচম্‌কাই জিজ্ঞাসা করলাম লাবণ্যকে। লাবণ্য চোখ তুলে তাকাল, —খুব ভালো খবর। অসিত এখন এ বাড়িতে আছে। এম. এ. দিয়ে এবার বিলেত যাবে।

—তাই এত চা বানানোর ঘটা !

আমি রসিকতা করে বলে উঠলাম। এবং তাতে কাজ হ'ল। লাবণ্য অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকাল। আমার ইঙ্গিত যেন তাকে একটু অবাক করেছে। সে কি যেন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, তার আগেই গাড়িবারান্দার তলায় অজয়দার ঢাউস গাড়িটা এসে থামল। গাড়িতে অজয়দা আর অসিত। লাবণ্য অসাধারণ বুদ্ধিমতী। আস্তে করে ট্রে-টা হাতে তুলে নিয়ে একটু হেসে বলল,—রুবি, তুই যা ভাবছিস তা নয়।

আমি হাসলাম। লাবণ্য আমার হাসি দেখে হাসল। লাবণ্যর হাসিটা খুব ফ্যাকাশে।

চায়ের টেব্‌লে লাবণ্যর সঙ্গে আমার বিশেষ কোনো কথা হ'ল না। কিন্তু আমি অসিতের দিকে সমানে চোখ রেখেছিলাম। সারাক্ষণ তার চোখ দুটি লাবণ্যের দিকে। তার কপালে ঘামে চুল জড়িয়ে হিজিবিজি ছবি।

শাড়ির বেড় সরু কোমরে আঁটো করে জড়ানো। লাবণ্য যে কত অপরূপ তা লাবণ্যকে দেখে বুঝতে হয়নি আমাকে। অসিতের চোখ দুটি বলে দিচ্ছিল।

সেদিন বিকেলী চায়ের আসরটা বাইরের বারান্দাতেই বসেছিল। ঘরে বৌদির মালিশের ঝি এসেছিল। দরজা বন্ধ করে বৌদি মালিশ নিচ্ছিলেন।

খানিক বাদে অবশ্য বৌদি নিজেই ডেকে পাঠালেন।

জানালা খুলে দেওয়া হ'ল। মালিশের গন্ধ উবে যেতে সময় লাগল না। তবু আমি কিন্তু বোধ করলাম ঘরের ভিতরে কোনো হাওয়া বইছে না। বড় গুমোট। বৌদি লাবণ্য আর অসিতের ওপর তেমন খুশি না। তাঁর চোখেও হয়ত তাদের ঘনিষ্ঠতা ধরা পড়েছে। সত্যিই ত লাবণ্যের মত একটা চালচুলোহীন আশ্রিত

মেয়ের সঙ্গে তাঁর এমন মূল্যবান ভাইকে কি করে জড়িয়ে পড়তে দিতে পারেন তিনি।

সেদিন যখন বাড়ি ফিরছি লাবণ্য বলল,—কাল তোর কলেজে যাবো, কথা আছে।

পরদিন লাবণ্য আমাদের কলেজে গেল। কলেজ থেকে আমাদের বাড়ি।

আমার বিছানায় উপুড় হয়ে গড়াতে গড়াতে লাবণ্য আস্তে আস্তে আমায় সব বলল।

অসিত লাবণ্যকে ভালোবাসে না। অসিত ভালোবাসে ওর অনেক দূর-সম্পর্কিত একটি মেয়েকে। নাম শমিতা। ওদের অনেকদিনের ভালোবাসা।

বাল্যপ্রেমও বলতে পারেন।

বাগবাজারের এক দারুণ বনেদী ঘরের মেয়ে শমিতা। তিনতলা থেকে দোতলায় নামতে হলেও তার জবরদস্ত দিদিমার অনুমতি নিয়ে নামতে হয়। খুব মেধাবী ছাত্রী ছিল বলে তার লেখাপড়াটা বন্ধ করতে পারেনি। কলকাতার সব চেয়ে বেশি পর্দা-দেওয়া স্কুলে পড়ত, তারপর সব চেয়ে বেশি রক্ষণশীল মেয়ে কলেজে। একবার রাস্তা থেকেও যে চলন্ত গাড়িতে দেখবে তাকে তারও উপায় ছিল না। গাড়ির জানলায় খাটানো থাকত ভারী পর্দা। শমিতার চৌদ্দ বছর বয়স হবার পর থেকে অসিত শমিতাকে খুব একটা কাছ থেকে দেখবার সুযোগ খুব কম পেয়েছে। দু'একটা পারিবারিক নেমন্তন্ন বাড়িতে ক্বচিৎ কখনো কাছ থেকে দেখা ছাড়া। লুকিয়ে-চুরিয়ে দু'একটা চিঠি লেখা ছাড়া দুজনের যোগাযোগ ছিল না তেমন। লাবণ্যের সঙ্গে অসিতের আলাপ অনেকদিনের। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা কেবলই অসিতের স্বার্থে। অসিত লাবণ্যর হাতে শমিতাকে চিঠি পাঠায়। শমিতার চিঠিও আসে লাবণ্যেরই হাত দিয়ে।

দ্বিতীয়া হেসে উঠলেন।

গৃহকর্ত্রী একটু চম্‌কে উঠে বললেন,—হাসছেন যে!

—হাসব না, দেখুন ত আপনি কত ভুল করেছিলেন। লাবণ্য কত ভালো মেয়ে। নিঃস্বার্থ ভাবে সে বন্ধুর জন্য এত করত, অথচ—

—ভুল? ভুল কি শুধু আমিই করেছিলাম? লাবণ্যর বৌদি করেননি, তারপর অজয়দা, তারপর আত্মীয়স্বজন চেনা-পরিচিত সকলে?

—জানেন, আপনার গল্প শুনতে শুনতে আমার কেবলই আমার বান্ধবীর

কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ওরও এই এক অভিযোগ। ভুল। কতকগুলো ভুলের জন্য ওর জীবনটাই নাকি নষ্ট হয়ে গেল।

দ্বিতীয়ার দিকে তাকিয়ে প্রথমা বললেন, —সত্যি!

—হ্যাঁ। আমি ত তাই-ই মনে করি। ওর গল্প আপনাকে একদিন বলব। কিন্তু আজ লাবণ্যের গল্পটাই শুনি।

—লাবণ্যের কথা শোনবার পর আমাকে আমার সমস্ত অনুমানই বদলাতে হ'ল। সত্যি, দেখুন অসিতের কথা আগাগোড়া আমার কাছে উহ্য রাখা, অসিতের লাবণ্যর জন্য অস্থিরতা, সিঁড়ির মুখে হাতে চিঠি গুঁজে দেওয়া, কলেজের সামনে অপেক্ষা করা, কথায় নিমগ্ন হয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া, এসব ঘটনার সিধে মানেটা যা হওয়া উচিত সেটা ছাড়া বাঁকিয়ে-চুরিয়ে অত ভাবতেই বা গেলাম কেন? আর আমি যা ভেবেছিলাম, অন্যরাও তাই-ই ভেবেছিল।

অসিত রোজ লাবণ্যর কাছে আসত। ড্রয়িংরুমে বা তিনতলায় লতাকুঞ্জ করা লাউঞ্জে বসে চাপা গলায় তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করত, কিন্তু তৃতীয়জন এলেই তারা চুপ করে যেত। ছুতোয়নাতায় অসিত লাবণ্যকে নানারকম উপহার দিত। লাবণ্য লাল সুপারি খেতে ভালোবাসত। অসিত লাবণ্যর জন্য পানের দোকান থেকে লাল সুপারি চেয়ে আনত। তাদের আত্মীয়-স্বজন এসব ভালো চোখে দেখত না। লাবণ্যর জন্মদিন ত, অসিতের কি?

নিশ্চয় দুজনের মধ্যে কোনো নিষিদ্ধ সম্পর্ক আছে। লাবণ্য সে-সময় প্রায়ই আমার কাছে আসত। কারণ তার আর কোনো উপায় ছিল না। আমি যখন জেনেই গেছি তখন আমার কাছে মনের ভাব মোচন করা অনেক সহজ। লাবণ্য সে-সময় অসিতের কথা ছাড়া ভাবত না বলত না। তার কাছে শমিতা আর অসিতের খুঁটিনাটি সব গল্প শুনতাম্। বার বার শুনেও আবার শুনতে ইচ্ছে করত। আস্তে আস্তে শমিতা আর অসিতের প্রেমের স্বরূপটা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

অসিত আর শমিতার বহুদিনের পুরোনো আলাপ। শমিতা তখন ফ্রক পরত, অসিত হাফ্‌প্যাণ্ট।

দেখুন আমি জানি না বাল্যপ্রেমের কোনো অভিশাপ আছে কিনা, তবে এটুকু বুঝেছি অন্তত অসিত আর শমিতার ব্যাপার দেখে বাল্যপ্রেমকে বিশেষ কোন মূল্য দিতে নেই।

অসিত আর শমিতা দুজনেই ছিল দারুণ ভাবপ্রবণ। দুজনেই খুব একটা

স্বাভাবিক শৈশব কাটায়নি

নানান নিধি কারণ ছিল। খুব পড়ুয়া ছিল দুজনে। যত রাজ্যের ট্র্যাস্ সেন্টিমেণ্টাল নভেল। বন্ধুবান্ধবরাও তেমনি জুটেছিল দুজনের। অল্পবয়সে পেকে গেলে যা হয়, কিছুদিন আলাপের পর দুজনেই দুজনকে বলতে শুরু করল যে তারা নাকি পরস্পরকে দারুণ ভালবাসে।

ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ কি?

প্রথমা ঘাড় ঘুরিয়ে উপহাসের এক তিক্ত হাসি হাসলেন।

—জন্মদিনে উপহার দেওয়া, বিজয়ার দিনে বিশেষ করে আড়ালে দেখা করে বিজয়ার সম্ভাষণ করা, কারণে অকারণে পরস্পরকে মোটা মোটা চিঠি লেখা, পরস্পরকে দেখলে একেবারে চোখ-মুখের চেহারা বদলে গিয়ে লজ্জা পাওয়া এইসব, আর এই সব।

কিন্তু জানেন কি দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত?

অভিভাবকদের হাতে ভালোবাসার প্রথম রাউণ্ডেই ধরা পড়ে গেল ওরা। অসিত আর শমিতা। তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ ছিল।

শমিতার বয়স তখন চৌদ্দ বছর আর অসিতের সতের। শমিতাদের বাড়ির দরজা তখন অসিতের কাছে বন্ধ।

অসিত প্রতিদিন তবু সেই দরজার সামনে এসে দাঁড়াত। শমিতাদের বাড়ির সামনে গ্যাস্‌পোস্টের মৃদু আলোয় তার ছায়া ঠিক সময়মতই দুলে উঠত।

আর শমিতাও নিয়ম করে ঠিক ওই সময়টায় তিনতলার বারান্দায় দাঁড়াতে ভুলত না।

ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, গ্রীষ্ম নেই, হিম নেই অসিত আসতই। আর শমিতা দাঁড়াতই।

দ্বিতীয়া হেসে ফেললেন, একেবারে রোমিও জুলিয়েট্ দেখছি। সেরিমেড্ গাইত সেই অসিত।

প্রথমাও হাসলেন। আবার এক তীব্র তিক্ত হাসি। তারপর চেয়ারে একটু হেলান দিয়ে বসে মাথাটা পিছনে ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন,—কিন্তু সেই দেখা আর কতক্ষণ? তাও ত শুধু দেখাই। কোনো শোনার বালাইও আর নেই।

সারাদিন যে পুরুষ তৃষ্ণায় পুড়ছে, মাত্র একবার তিনতলার বারান্দায় কয়েক মুহূর্তের জন্য সেই ছায়াহরিণীকে দেখে তার কতটুকু তৃষ্ণা আর মিটতে পারে বলুন?

কুঁজোয় যখন জল থাকে না, তখন যদিও বা তৃষ্ণাকে রোখা যায়, গলা ভেজানোর মত জল থাকলে কিন্তু কিছুতেই আর তৃষ্ণাকে বাঁধ দেওয়া যায় না। তা আরও প্রবল, সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে।

অসিতের তখন শুধু শমিতার কথা আর শমিতার ভাবনা। সর্বক্ষণ, সর্বসময় জুড়ে। সোজাসুজি দেখা করার ব্যাপারটা স্বাভাবিকতার কণ্ঠ তখন একেবারেই রুদ্ধ করে দিয়েছে। ফাঁক আর ফোকরের অস্বাভাবিক ছোট রেধের মধ্য দিয়ে তাই বেগ আরো তীব্র আরো গোপন আর আরো নিষিদ্ধ।

যাকে ভালোবাসা যায় তার কথা কীর্তনেও অসহ্য আনন্দ। অসিতের সে আনন্দও ছিল না। এমনি সময় সে লাবণ্যর সঙ্গে পরিচিত হ'ল। যদি শমিতা না থাকত, এ কথা সত্যি লাবণ্য অসিতের মন জয় করে নিতই।

একজন অত্যন্ত পরিণত মমতাময়ী নারীর সমস্ত গুণ সমস্ত বিবেচনা-বুদ্ধি লাবণ্যর মধ্যে ছিল। ওই সতের বছরের লাবণ্যের মধ্যে।

অসিত মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-চকিতের মত অবাক হয়ে যেত। ভাবত, আশ্চর্য, কি করে লাবণ্য এত সব বোঝে? বুঝতে পারে?

দেখুন, আসলে শমিতা তো বড়মানুষের আহ্লাদী মেয়ে ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যা যখন চেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতে পেয়েছে। তাই অসিতকে না পেয়ে তার সারামন একেবারে দুরন্ত হয়ে উঠল। অসিত আর তার মধ্যে নিয়মিত দেখাশুনা একেবারেই বন্ধ। রোজ গিয়ে রোজকার জমে ওঠা ভুল, আর ঘনিয়ে ওঠা মান ভাঙানো তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আর সেই সব বানানো দুঃখ উস্কে উস্কে বিকৃত সুখ আর অধিকার-বোধ তৈরী করার সুযোগও ছিল না শমিতার। তাই শমিতা তার আর অসিতের নিয়মিত যোগাযোগের একমাত্র বাহন চিঠিতেই তার সব কথা, সব জ্বালাকে চালান করে দিতে চাইত।

প্রতি চিঠিতেই শমিতার মর্মান্তিক ভাষায়, জ্বালায়, ভয় দেখানো শাসানিতে আকুল প্রার্থনায় শমিতা এমন বিপর্যস্ত, লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিত অসিতকে যে অসিত আর কিছুতেই, কোনো প্রাত্যহিক কাজে মন বসাতে পারত না।

জানেন, সেজন্য একবার অসিতকে বি. ই. পরীক্ষা দিতে দিতে হল থেকে পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে হয়েছিল।

সেই দিনই শমিতা-অসিতের ব্যাপারটা লাবণ্য প্রথম জানতে পারে।

দিদির বাড়ি থেকেই পরীক্ষা দিচ্ছিল অসিত।

লাবণ্যই পরীক্ষার্থীর সুখ-সুবিধা সব কিছু দেখাশোনা করত।

একদিন দুপুরে অসময়ে অসিত বাড়ি ফিরে এল।

লাবণ্য তখন সবে পুডিং তৈরী করে, জুড়িয়ে, ফ্রিজে ভরছে। ডাইনিং রুমের টেবিলে ফল সাজানো। ফলের ওপর পাতলা জাল্‌তির ঢাক্‌না উপুড় করা। অসিতের বিকেলের জলখাবারের প্লেট্‌ গ্লাস উপুড় করা। চিঁড়ে ভেজাবে বলে কাঁচের বাটিতে ঢেলে রেখেছে। কাটা লেবু জলে ভেজানো। লাবণ্যর নিজের হাতে পাতা দৈ ফ্রিজে ঠাণ্ডা হচ্ছে। অসিতকে ডাইনিং রুমে ঢুকতে দেখেই লাবণ্যর মুখ শুকিয়ে গেল।

ফ্যাকাশে মুখ, দু কনুই এর যুগ্ম বৃন্তাগ্রে রেখে অসিত বসে পড়েছে।

লাবণ্য তাকে কোনো প্রশ্ন করল না। দূর থেকে কিছুক্ষণ তাকে দেখল। তারপর কাছে এল। অসিতের ফুরফুরে চুলের সুগন্ধি শ্যাম্পুর গন্ধ তার নাকে লাগল। নীচু হয়ে অসিতের বুকপকেট হাতড়াল। দুটো ফাউনটেন পেনই যেমন কালি ভরে দিয়েছিল ঠিক তেমনি রয়েছে। নিটোল ভর্তি। কোয়েশ্চেন পেপার নেই। লাবণ্য অসিতের সামনের চেয়ারটায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

—সত্যি জানেন, আমিও জানি, অপেক্ষায় কি না হয়? অপেক্ষার মত অপেক্ষা করতে জানলে, অনেক দুর্লভও সুলভ হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়া বললেন।

—আমিও আপনাকে আমার এক বন্ধুর কথা বলব। সে বেচারীও বহু বছর—বহু বছর ধরে অপেক্ষা করেছিল। এখন, এতদিনে তার অপেক্ষার ফল ফলছে।

প্রথমা হাসলেন।

—কিন্তু অপেক্ষার সেই দিনগুলো! সেই দিনগুলোর যন্ত্রণা কে ভুলবে বলুন!

যাই হোক, লাবণ্যর কথা শুরু করি। লাবণ্য জানত অপেক্ষা করতে পারলে অসিত নিজেই সব বলতে আরম্ভ করবে। তাই সে অসিতের সামনে হাল্কা সবুজ রঙের আমের শরবৎ রেখে চুপচাপ বসে রইল।

অসিত ডাইনিং রুমের সেই আধো অন্ধকার দুপুরে নির্জনতায় বসে ক্রমশ নিজেকে ফিরে পেতে লাগল। সে মাথা তুলে দেখল লাবণ্য তার স্নিগ্ধ চোখ দুটি নিয়ে অসিতের আনুকূল্যের জন্য অপেক্ষা করে আছে। অসিত আস্তে

আস্তে চাপা গলায় বলল,—যদি সে তোমার মত আমাকে বুঝতে পারত লাবণ্য! আচ্ছা বলো তো, মানুষ এত অবুঝ হয় কেন?

—কে অসিত?

—শমিতা!

—শমিতা কে?

অসিত পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে দিয়ে বলল, চিঠিটা পড়ে দেখ।

লাবণ্য টেবিলের ওপর ফেলে দেওয়া চিঠিটা দেখল। তারপর আস্তে তুলে নিল। তার হাত একটুও কাঁপল না। নীল পাতলা বিলিতি চিঠির কাগজে ঘোর বেগুনী কালিতে টানা টানা লেখা। বা লেখা টানা টানা, বলতে পারেন। মনের বেগ আর হাতের বেগেই মেয়ের সামঞ্জস্য নেই। উদ্ধত হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ, রেফ্‌, হসন্ত! কি লিখেছে, কি লেখেনি তাতে তার ঠিকঠিকানা নেই। ঐ একটা চিঠিই বলে দিচ্ছে, এ মেয়ে কি ভীষণ ভাবে চাইতে জানে। "এক মাসের মধ্যে যদি অসিত তাকে উদ্ধার করে নিয়ে না যায় তাহলে শমিতা বিষ খেয়ে মরবে।"

পরীক্ষার আগের দিন রাতে এই চিঠি পাবার পর তো অসিতের মাথা ঘুরে যাবেই।

লাবণ্য কিছু বলল না। বলা সাজে না।

হঠাৎ কিছু করে বসা, হঠাৎ কিছু বলা লাবণ্যের চরিত্রেই নেই। সে প্রশ্ন করে করে অসিতের কাছ থেকে সমস্ত জেনে নিল। জেনে নিয়ে আবিষ্কার করল, ভালোবাসার এত সুখ যে রক্ত পড়বে জেনেও যেমন উটে কাঁটা গাছ খায়, তেমনি মানুষ, সাধ করে দুঃখ পাবে জেনেও অন্যকে ভালোবাসে।

—হয়ত আপনার বান্ধবী লাবণ্য সেদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে ভীষণ অবুঝ আর নির্বোধ হতে চেয়েছিল। হয়ত ভেবেছিল এই সব সোনার পেতল মূর্তির জন্যই ছেলেরা আত্মহত্যা করে, পরীক্ষা দিতে দিতে উঠে আসে, মদ খেয়ে দেবদাস হয়।

—তা নয়, তবে প্রায় তাই-ই হয়ত ভেবেছিল লাবণ্য। সেই দিন প্রথম সে বুঝতে পেরেছিল অসিতের দুঃখ তাকে কি ভাবে, কতখানি, আমূল নাড়িয়ে দেয়। অসিতের একটা বছর একটা মেয়ের সামান্য অবিমৃষ্যকারি চিঠিতে নষ্ট হ'ল এ অবিচার লাবণ্য সইতে পারছিল না। আবার অসিতের পরীক্ষা না

দেওয়ার যন্ত্রণা, ক্ষোভের তলায় আত্মদানের সূক্ষ্ম পৌরুষ অসিতকে তার কাছে কম আকর্ষণীয় করে তোলেনি।

পরদিন সকালবেলা লাবণ্য যে কথা রাত্রে ভেবে শুয়েছিল সে কথাটা আবার ভাবল। ভেবে ভেবে সংসারের সকালবেলাকার সমস্ত কর্তব্যকর্ম শেষ করে শমিতাদের পর্দা-দেওয়া কলেজের দিকে পা বাড়াল। পর্দা-দেওয়া কলেজ মানে একান্তই মেয়েদের অত্যন্ত স্ট্রিক্ট্ ধনীদের কলেজ আর কি। প্রায় স্কুলের মত কড়াকড়ি।

লাবণ্য যখন ভিতরে গেল, শমিতাকে অনেক কষ্টে খুঁজে বের করল, তখন শমিতা মনের আনন্দে বান্ধবী পরিবৃত হয়ে হাসছে, খেলছে আর আইসক্রিম খাচ্ছে।

কে বলবে যে এই মেয়ে অসিতকে অমন সর্বনেশে একটা চিঠি লিখে বসে আছে। মুখের রেখায় রেখায় তার আর কোনো ভাবনা নেই। মাত্রই রূপ। মাত্রই যৌবন। মাত্রই সুখ।

লাবণ্য শমিতার কাছে গিয়ে বলল, আমি লাবণ্য। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।

শমিতা তাকে একটা নির্জন ক্লাসরুমের শেষ প্রান্তে নিয়ে গেল।

—জানো তোমার চিঠি পেয়ে অসিত এত চিন্তা করছে যে, পরীক্ষার হল থেকে উঠে চলে এসেছে।

শমিতা চোখ বড় বড় করে সব শুনল। কিন্তু অসিতের জন্য তার কোনো দুঃখ হয়েছে বলে মনে হ'ল না। সে শুধু বোকার মত কতকগুলো বিশৃঙ্খল কথাবার্তা বলল। তার বড় ভয়। সব সময় তার মনে হয় তার পায়ের তলায় মাটি নেই। সে এখন ত্রিশঙ্কু। মনে হয় অসিতকে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে!

চিঠি না পেলেই শমিতার এমনি মনে হয়। চিঠি যখন লিখেছিল তখন সে সত্যিই ঠিক করেছিল সে আত্মহত্যা করবে। লাবণ্য কিন্তু দেখছিল গোলগাল ফর্সা নিটোল সুন্দর একখানি মুখ। আত্মহত্যা করার মত অবস্থা হলে মেয়েদের যেমন চেহারা হয়, এ মেয়ের তার ধারেকাছেও চেহারা নয়।

—কিছু মনে করবেন না, দ্বিতীয়া বললেন, আপনার কথার মাঝখানেই একটু বলে নিচ্ছি। আমাদের পাড়ায়, বাপের বাড়ির পাড়ার পুরোনো গল্প বলছি। আমার মায়ের এক বান্ধবী, আমরা তাঁকে সুধামাসীমা বলতাম। আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করলেন। তার আগের পনের মিনিটে তিনি হেসে

হেসে পাড়ার তিনটি বাড়ি থেকে তিন বোতল কেরোসিন ধার করে এনেছিলেন। কেউ বুঝতেও পারেনি। যাক্‌গে ও কথা। এবার আপনি আপনার গল্প বলুন।

শমিতার খবর নিয়ে ফিরে এসে লাবণ্য অসিতকে নিশ্চিন্ত করল।

অসিত এতটা আশা করেনি। তার দুশ্চিন্তা দেখে লাবণ্য ছুটে শমিতার কলেজে চলে যাবে, শমিতার খবর আনবে এতটা তার পক্ষে ধারণাতীত ছিল।

অসিত লাবণ্যকে দিয়ে শমিতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের একটা নতুন রাস্তা পেয়ে দারুণ খুশি। লাবণ্যর কাছে শমিতার কথা বলেও শান্তি। অন্ততঃ নিজেকে প্রকাশ করবার একটা রাস্তা তো পাওয়া গেল। তাছাড়া লাবণ্যর মত এত মমতাময়ীই বা কে?

সে এই সতের বছর বয়সে মাত্রই বাক্সবন্দী হয়ে, বাইরে যখন রঙীন রঙীন বিকেলগুলো উড়ে যাচ্ছে, তখন অসিতের ভালবাসার ফলাও কাহিনী শুনে যাবে? অসিতের অতীত বর্তমানের স্মৃতি আর সমস্যা, ভবিষ্যতের সোনালী প্ল্যান্‌ ধৈর্য ধরে শুনবে? কেই বা অসিতের একাকীত্ব অপনোদনের জন্য, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে শুধু সঙ্গ দেবার জন্যই বেড়াতে বেরুবে! আর্ট একজিবিশন্‌, মেলা মায় সিনেমা! অসিত আর লাবণ্য, আর মধ্যবর্তিনী শমিতা,—না বরং বেশ ভালো, অসিত আর শমিতা আর মধ্যবর্তিনী লাবণ্য এই ভাবে বেড়াত ঘুরত সিনেমা যেত।

—আপনার শেষের উপমাটাই বড় অবিশ্বাস্য ঠেকছে আমার কাছে। যাক্‌ শেক্‌সপীয়রের হ্যাণ্ডিক্যাপ তো রয়েইছে। স্বর্গ ও পৃথিবীর সেই অধিকন্তু ব্যাপারটা। যাক্‌ গল্পটা বলুন।

—এভাবেই দিন যাচ্ছিল অসিত আর লাবণ্যর। কিন্তু জানেন বোধ হয় সময় নিজে বদলায় বলে, চলে যায় বলে ঘটে যাওয়া ঘটনাও স্থির থাকতে পারে না। চলন্ত বাসে ব্যালেন্স রেখে যাওয়ার মত, একটা ক্রমাগত প্রচেষ্টা না রাখলে আপনাকে তো ছিটকে পড়তেই হবে। অসিত আর লাবণ্যর এই অত্যধিক মেশামেশির উপরের স্রোতের আড়ালে আড়ালে, তলায় তলায় শমিতাগত ব্যাপারটা দিব্যি চাপা চালানো যাচ্ছিল কিন্তু লাবণ্য আর অসিতকে নিয়ে ছিছিক্কার ক্রমশই উচ্চৈশ্রব হতে লাগল।

অসিতের লাবণ্যর প্রতি এই রকম অসাধারণ বাধ্যতা সব চেয়ে অসহ্য ছিল লাবণ্যর বৌদির কাছেই। চাকরবাকর, মায় অজয়দা অব্দি লাবণ্যর বাধ্য

হোক তাতে তাঁর কোনো খেদ নেই। সময় বুঝলে অবাধ্য হয়ে লাবণ্যকে তাড়িয়ে দিতেও তাঁর দেরি লাগবে না। কিন্তু অসিতের এ কি চরিত্রবিরুদ্ধ কাণ্ড।

লাবণ্যের সেলাই-এর সুতোর রঙ্ মেলানো নিয়ে অসিত যে কোনোদিন মাথা ঘামাতে পারে, লাবণ্য গুজরাটী দোকানের ডালমুট খেতে ভালোবাসে পকেটে করে তাই বয়ে আনতে পারে শেষ পর্যন্ত, লাবণ্যর জন্মদিনে গোলাপ-গুচ্ছ, বিলিতি সেণ্ট—বৌদি অসিতের এই বাধ্যতায় নিরুপায় বাঁধা জন্তুর মত গজরাতে লাগলেন।

গর্জে কোনো লাভ হল না। জানেন। কারণ বৌদি ওই বিছানায় শুয়েও পরিষ্কার জানতেন লাবণ্য কখনও অসিতকে মুখের কথায় বা কাজে কিছু করতে বাধ্য করবে না। লাবণ্য সে জাতের মেয়েই নয়। লাবণ্য নম্র সেবিকা মাত্র। আর নম্র বিনয়ী সেবিকা ধরণের মেয়েদের তো, পুরুষদের আলুনি লাগে। তাই না, বলুন? যে মেয়ে আঁচলে ঘূর্ণি তুলতে পারে না, ভ্রূ-বিভ্রমে রাগ দেখাতে পারে না, জানে না কি করে দেহ আর মন আধো ঢেকে, আধো খুলে পুরুষদের ভোলাতে হয়, সে মেয়ের পেছনে অসিত ছুটবে কেন? এ কথা ভাবতে বৌদির সত্যিই অবাক লাগে।

সমস্ত আকাশ যখন থমথম করে, মেঘের ওপাশে চাপা বিদ্যুৎ খেলিয়ে ঝড় ওঠার কথা বুঝিয়ে দেয়। লাবণ্যর মধ্যে যে এতটুকু চাপা বিদ্যুৎ ছিল না। বৌদির ক্রমশ ধারণা হতে থাকল, যে ঝড়ে বিদ্যুৎ সম্বৃত থাকে সে ঝড় বোধ হয় সর্বগ্রাসী।

তিনি লাবণ্য আর অসিতের সম্বন্ধটাকে আর বেশি দূর বাড়তে দিতে চাইলেন না। লাবণ্যকে উদ্দেশ করে বাছা বাছা বাক্যবাণ প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। লাবণ্যর শেষকালে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে তার দাদার বাড়ির সৌখীন বোনগিরির পালা একদম চুকুতে চলল।

সে সময় আমিই লাবণ্যকে বলেছিলাম বৌদিকে অসিত আর শমিতার সব কথা মুখফুটে বলে দিতে। আমার কথা শুনে, জানেন, লাবণ্য অদ্ভুত হেসেছিল।

—পাগল! অসিত তাহলে মরে যাবে। অসিত পাগল হয়ে যাবে। আরো কয়েকটা দিন যাক রুবি। আরো কয়েকটা দিন একটু সয়ে থাকি। অসিত আর শমিতা প্রায় সব বন্দোবস্তই ঠিকঠাক করে এনেছে। অসিত বি. ই. পাশ করেছে। এখন একটা ভালো ফার্মে কাজ পাবার কথা হচ্ছে।

এখন অবিশ্যি বেশি দেবে না। যাই হোক্, ওর আর শমিতার অবশ্য দিব্যি চলে যাবে। আর ততদিনে শমিতারও একুশ বছর বয়স হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বিয়েতেও বাধা হবে না। ওদের সব দিক গোছানো-গাছানো হয়ে যাবে। আর সমস্ত ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে গেলে তো বৌদিরা জানতেই পারবে—অসিত শমিতার সম্বন্ধটা। তার আগে আর আমি সব বলেকয়ে ভেস্তে দিই কেন ?

আমি বলেছিলাম, তা বলে, তুই দুর্নামের ভাগী হবি কেন লাবণ্য ? তুই নিজের ভালোমন্দর দিকে একবারও তাকাবি না ?

লাবণ্য শুধু মৃদু হেসেছিল। আর কিছুই বলেনি।

জানেন তারপর বহুদিন লাবণ্যর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না। কি কারণে যে যোগাযোগ হয়নি তা আজ আর আমার মনে পড়ে না। শেষ পর্যন্ত আমি লাবণ্যর খোঁজ নিতে একদিন অজয়দার বাড়ি ফোন করেই বসলাম।

অজয়দা জানালেন লাবণ্য এখন তার পরীক্ষা নিয়ে খুব ব্যস্ত।

আমি শুনে খুব খুশিই হলাম। লাবণ্য তাহলে এতদিনে তার নিজের পড়াশুনোয় খানিকটা মন দিয়েছে। অসিতের কথা ভেবে ভেবেতো বেচারীর নিজের পড়ার বইগুলোয় ধুলো পড়ে গিয়েছিল।

আমারও পরীক্ষার চাপ ছিল, তাই আর খোঁজ নেওয়া হয়নি লাবণ্যর।

পরীক্ষা হয়ে যাবার পর সব চেয়ে আগে মনে পড়ল লাবণ্যকে। অজয়দাদের বাড়ি লাবণ্যকে দেখতে গেলাম।

সত্যি লাবণ্য মেয়েটা যেন মমির মত। পাঁচ হাজার বছরেও বদলাবে না। সেই চা করছে। সেই কেতলি ধরছে নিপুণ হাতে। পেয়ালা ভরে দিচ্ছে টইটম্বুর করে, অথচ পীরিচে চা পড়ছে না। শান্ত ভ্রূর তলায় নীচে নম্র দুটি চোখ, ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চাপা। ভাবলেশহীন মুখ।

ফাঁকা পেয়ে আমি লাবণ্যকে জিজ্ঞেস করলাম, কি, তোমার বন্ধু অসিতবাবুর খবর কি ?

লাবণ্য বলল, জানিস না, দারুণ খবর। অসিত শমিতাকে বিয়ে করেছে।

আমি মনে মনে লাফিয়ে উঠেছিলাম। তখন আমাদের যা বয়স, অভিভাবকদের কড়া শাসন ডিঙিয়ে কেউ ভালোবাসা টাসা করতে পারলেই সে আমাদের কাছে দারুন 'হিরো'। আর ভালোবাসায় সফল হলে তো বলে কাজ নেই।

বিশেষ করে অসিত আর শমিতার ব্যাপারটা। ওদের ভালোবাসাটা কেবল ওদেরই নিজস্ব মাথাব্যথার ব্যাপার ছিল না। ওটা ক্রমশই লাবণ্যর জীবনের একমাত্র পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লাবণ্যর ভাবনাচিন্তাগুলো ক্রমশঃ আমার মধ্যেও সংক্রামিত হচ্ছিল। আমিও ওদের ব্যাপারে খুব চিন্তিত, ভাবিত ছিলাম। কিন্তু ওদের বিয়ের কথাটা লাবণ্য এরকম শাদা জুড়োনো গলায় বলল কেন ?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কবে বিয়ে হ'ল ? অসিত কাউকে বলেনি ?

—তিন মাস আগে বিয়ে হয়েছে। অসিত অবশ্য বলেছিল তোকে খবর দিতে।

আমি উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম, তা খবর দিলি না কেন ?

—তোর তো পরীক্ষা ছিল, তাই খবর দিইনি !

—বেশ করেছো।

রেগেমেগে বললাম আমি। তোমার ঘটে তো প্রচুর বুদ্ধি হয়েছে। এমন একটা ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার, একটা রেজিস্টার্ড বিয়ে—ভাবা যায় ! পরীক্ষা-টরীক্ষা শিকেয় তুলে দিয়ে চলে আসতাম। তুই যে দিন দিন কি বোকা হয়ে যাচ্ছিস্ !

জানেন আমার উচ্ছ্বাসের উত্তরে লাবণ্য কিন্তু একটি কথাও বলল না। আমাকে প্লেটে নানানবিধি খাবার সাজিয়ে দিতে লাগল।

আমি বললাম, নাও এখন চলো দেখি। অসিত-শমিতাদের বাড়ি চলো, অপরাধ যা হয়েছে সব স্খালন করে আসি।

লাবণ্য বলল, না।

—মানে ?

লাবণ্য এবার গলার স্বর আর একটু তুলে পরিষ্কার কাটা-কাটা উচ্চারণ করে বলল, সিনেমায়-টিনেমায় দেখেছিস তো, চায়ের আসরে উত্তেজিত হয়ে কথাবার্তা বললেই পেয়ালা-পীরিচ ভেঙে যায়। জানিস তাই আমার মনে হয় চীনেবাসন যেখানে, সেখানে কখনো ষাঁড় আনতে নেই। অসিত আর শমিতার বিয়ে নিয়ে আমার একটা চিন্তা ছিল। হয় কি না-হয় ভাবনা। এখন সেটা চুকেছে। এখন আর অধিক চিন্তায় কাজ কি ?

আমরা ভাই এখন বুল্, আর অসিত্য-শমিতার বাড়িটা হ'ল, ধরেনে একটা চায়না শপ্ ! ওসব বাজে ঝামেলা ছেড়ে দিয়ে এখন চিন্তা কর দেখি, পরীক্ষায় পাশ করার পর কি করা যাবে ? বুঝলাম কোনো কারণে লাবণ্য অসিত

শমিতার কথা আর আলোচনা করতে চাইছে না। বোধ হয় দাদা-বৌদি কিছু শুনতে পাবেন বা জানতে পারবেন ভেবে সে ভয় পাচ্ছে। অসিত-শমিতার মিলনের ব্যাপারে তারও যে একটা ভূমিকা আছে এ কথা হয়ত লাবণ্য জানাতেই চায় না। কারণ এ বাড়ির আশ্রয় তার সত্যিই প্রয়োজন। তাছাড়া পারিবারিক দিক দিয়েও এ ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে লাবণ্যর সুনাম তো বাড়বেই না, উপরন্তু বদনাম হবে। লাবণ্যর দাদার বাড়ি থেকে ফেরার পথে আমি রুটিন কর্তব্য সারতে বৌদির ঘরে গেলাম। দেখলাম ব্যাপারটা বেশ ভালো ভাবেই মিটমাট হয়ে গেছে। নইলে বৌদির গড্‌রেজের আলমারীর মাথায় শমিতা আর অসিতের চমৎকার ছবি! আমি যেন কিছু জানি না এমনি ভাবে বৌদিকে জিজ্ঞেস করলাম। অসিতবাবুর বুঝি বিয়ে হয়ে গেছে? কবে হল? বৌদি তো সবিস্তারে ভাই-এর বীরপনার কথা বলতে শুরু করলেন। তাতেই শমিতা আর অসিতের বিয়ের খুঁটিনাটি ঘটনাগুলো জানা গেল।

—জানো ভাই, আমাদের দারুণ আপত্তি ছিল। দু পক্ষেরই। কিন্তু অসিত যখন সাহস দেখিয়ে একটা কাণ্ড ঘটিয়েই বসল তখন আর কি করা?

প্রথমা বললেন, ব্যাপারটা দারুণ রোমাণ্টিক। অপ্রাসঙ্গিক হলেও আপনাকে না বলে পারছি না। আসলে আমাদের তখন যে বয়স, সে বয়সে ওই সব ঘটনা মনে দারুণ দাগ কেটে যায়। কাটে না, বলুন?

গল্প থামিয়ে দ্বিতীয়া বললেন, বাঃ বলুন না,অপ্রাসঙ্গিক হবে কেন? গৃহপোষ্য জীব বলেই তো এই সব রোমাণ্টিক ব্যাপার নিয়ে আমাদের জল্পনাকল্পনা একেবারে লাগাম ছাড়িয়ে যায়। যায় না? ধরুন আপনার বন্ধুপ্রিয়া শমিতা, নিশ্চয়ই গভীর রাতে অন্ধকারে টিপিটিপি বেরিয়ে দরজা খুলে গেট পেরিয়ে অসিতের কোলের কাছেই প্রায় লাফিয়ে পড়ল। অসিত টপ্‌ করে ধরে গাড়িতে হোক্ ট্যাক্‌সিতে হোক নিয়ে পালাল।

—আপনাকে বাহবা দিই। প্রায় সত্যের ধার ঘেঁষে গেছেন। হ্যাঁ, ঘটনাটা প্রায় ঐরকমই ঘটেছিল। যাক এখন আর অত ডিটেল বলব না, আমার গল্পটা চালিয়ে নিয়ে যাই তাড়াতাড়ি। সত্যি বলছি এবার একটুও ঢিলে দেব না। শমিতা আর অসিত বিয়ে-থাওয়া করে দিব্যি সংসার পেতে বসল। অসিতের চাকরিটা মূল্যবান ছিল না খুব। কিন্তু ওর বাবা খুব মূল্যবান ছিলেন। তিনি ছেলেকে একটা দায়িত্বশীল পদে বহাল করে দেবার জন্য যথাসাধ্য কলকাঠি নাড়তে লাগলেন।

ট্রে'র ওপর কাঁচের বাসনের অল্প থর্‌থর্‌ কাঁপুনির আওয়াজ উঠছে। দ্বিতীয়া পিছন ফিরে তাকালেন। প্রথমার চাকরটি কফি এনেছে। খাস বিলিতি পোর্সিলিনের হাল্কা কফিসেটা। শাদা আর সোনালী কাজ করা।

দুপুরের শেষপ্রান্তটি তখনো রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষায় বারান্দার পাদানীতে রোদের জড়িপাড় কোঁচার ফুলটি ছুঁইয়ে রেখেছে। বারান্দায় বসানো আচারের সার সার জারে লাল ঘন রোদ। রোদ আর রোদের গরম গন্ধ তখনও গোলমোরের ডাল ছাড়েনি। সারা মাঠ থানাখন্দ রেল লাইনে লাইনে চিক্‌চিক্‌ করছে।

কালো কফি নিজের কাপে ঢেলে নিয়ে প্রথমা শ্রোত্রীর কফিতে দুধ মেশাতে লাগলেন। একেবারে শিক্ষিত হাতে, এক ফোঁটাও পীরিচে না ফেলে দ্বিতীয়ার দিকে এগিয়ে দিলেন প্রথমা।

দ্বিতীয়া হেসে পেয়ালাটা ঠোঁটের কাছে তুলে নিয়ে বললেন, বাঃ, আপনিও তো দেখছি আপনার গল্পের লাবণ্যর মত এককোঁটা দুধ পীরিচে না ফেলে, চমৎকার কফি বানাতে পারেন।

—আমি, হ্যাঁ, আমি লাবণ্যর মত অনেক কিছুই পারি। লাবণ্যর মত অনেক কিছু পারি বলেই তো এখনও আমি বাতিল কাগজের বাক্সে পড়িনি। লাবণ্য বড় ভালো সেলাই জানত। সেই শিল্পটাও আমার কিছু কিছু রপ্ত আছে বলেই তো, আপনি এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। নাহলে কি আর আসতেন মাঝে মধ্যে! অতএব একলা আর বাতিল থাকতে হত। কফিতে চুমুক দিয়ে প্রথমা গল্পটির ভাঙা অংশ জোড়া দিলেন, এই যে লাবণ্য আর শমিতার বিয়ে— ব্যাপারটা দারুণ ভাবে মিলনান্ত হওয়া উচিত ছিল, তাই না? আমার ধারণা যে কোনো পপুলার ঔপন্যাসিক এই রকম পালিয়ে, এ্যাড্‌ভেঞ্চার করে বিয়ে করার মালমশলা পেলে একেবারে লুফে নিয়ে পাতলা সেলোফেনের ওড়না জড়ানো সোনামীনে মলাট-মোড়া উপন্যাস লিখে, লাগসই নাম দিয়ে, বিয়ের মরশুমে ভালোই রোজগার করে নিতেন।

কিন্তু জীবন ব্যাপারটা ভারি বিশ্রী। জটিল।

ওটা যেখানটায় শেষ হওয়ার কথা ঠিক সেইখানটায় কিছুতেই শেষ হতে জানে না। হয় খানিকটা আগে ধক্‌ করে থেমে গিয়ে বলবে আর স্টার্ট নিচ্ছে না।

আবার কখনো, রাস্তা নেই জেনেও, হিজিবিজি খানিক দূর চলে গিয়ে যন্ত্র-পাতি বিগড়ে চাকাটাকা পাংচার হয়ে উল্টেপাল্টে পড়ে থাকে।

আমাদের শমিতা অসিত লাবণ্যের ব্যাপারটাও সেই চেহারা নিল।

ওরা ইতিমধ্যে দিব্যি সংসার পেতেছে। কলকাতায় বালিগঞ্জের এক বেশ মনোরম অঞ্চলে চমৎকার তে-ঘরা ফ্ল্যাট্। ড্রইং-ডাইনিং-রুম আর একটু পোর্টিকো। মাধবীলতার আস্ত একটি লতা। শোয়ার ঘরে চন্দনকাঠের বেড্‌ল্যাম্প, খাবার টেবিলে রোজ বোলে গোলাপগুচ্ছ, যতদিন না ছেলেপুলে হয়, আদর করার জন্য পুষল কুকুর পর্যন্ত। কিন্তু এত কষ্ট করে বিয়ে-থাওয়া করার পরও অমন সাজানো বাড়ির সাজানো সংসারে শমিতা আর অসিত তেলজলের মত আলাদা হয়ে রইল।

মহিলা সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর কণ্ঠে সম্বৃত জ্বালা, আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না, একটা মেয়ে কি পরিমাণ অকর্মণ্য হতে পারে! কি পরিমাণ অপদার্থ! শমিতা ধনীঘরের মেয়ে ছিল সন্দেহ নেই। বাপের বাড়িতে তাকে নড়ে খেতে হয়নি সে কথাও ঠিক। কিন্তু আপনিই বলুন, অন্ধকার ঘরে লতা রাখলে সেই অবলা লতাও বাঁচার জন্য আলোর দিকে মুখ ফেরায়। আর তুই আস্ত একটা মানুষ হয়েও তোর ভালোবাসার হাত ধরে একটা ধাপও উঠতে পারলি নে।

ওদের বিয়ের পর আমি নিজের থেকে একবার গিয়েছিলাম অসিত আর শমিতার বাড়ি। কিছু খাওয়ানো দূরে থাক, আমাকে শমিতা এক গ্লাস জলও খেতে বলেনি। ঘরদোরের যে কি অবস্থা তা আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না। আমি সেই একদিনেই বুঝেছিলাম কোনো ভালোবাসার ঘর এমন হয় না।

বিয়ের বছর না ঘুরতেই দেখা গেল শমিতার বেশির ভাগ শাড়ি-ব্লাউজই হয় ছেঁড়া না হয় চুরি গেছে না হয় হারিয়েছে। অনিয়মিত কিম্বা ঠিকেঝি সেগুলো দিয়ে ঝাড় বা ন্যাতা বানিয়ে নিয়েছে। অসিতের একটা আস্ত ধুতি বা ফুলস্যুট্ আপনি খুঁজে পাবেন না।

অফিস থেকে ফিরে প্রায়ই অসিতকে শুনতে হবে চাকর নেই তাই চা হয়নি। তখন কেতলি হাতে বেচারীকে ছুটতে হয় দোকানে। তৈরী চা আনতে হয়।

ওদের সংসারে অসিতকেই মাসকাবারী হিসেব করতে হ'ত। দুধ আনা, ধোপার কাপড় আনা সব। সব শেষ করে যখন, তখন শমিতার মাথা ধরলে বসে বসে অডিকোলন লাগানো।

—তাই, নাকি? ভারী আশ্চর্য তো!

—ওটাও এমন কিছু না। অলস অবুঝ বৌ অনেকেই থাকে। সে-সব ক্ষেত্রে স্বামীরা ভালোবাসার করুণায় গাছ থেকে লতা হয়ে যায়। পরিচর্যায় বেঁকে যায়। সর্বস্ব হয়ে ছোঁয়।

শুধু তাই নয়, শমিতার বিষম অন্য একটা রোগও ছিল। শমিতাকে কিছুতেই স্বাভাবিক বলা যেত না।

অসিতের রেজেস্ত্রী বিয়ের পর যখন প্রীতিভোজের একটা ব্যাপার ঠিক করা হল তখন শমিতা মুখ খুলল। সে স্পষ্ট ভাষায় বলেই বসল, লাবণ্য এই প্রীতি-ভোজে আসবে না। লাবণ্য সম্পর্কিত কেউ না।

এই কথাটা লাবণ্য প্রথম প্রথম লজ্জায় আমাকে খুলে বলতে পারেনি। পরে যখন বলল তখন বুঝতে পারলাম ঘটনাটা কি রকম অস্বাভাবিক।

আপনি ভাবতে পারেন, মেয়েরা এত হৃদয়হীনও হয়!

দ্বিতীয়া কফির নিঃশেষিত কাপটি নামিয়ে রেখে বললেন, সত্যিই তো, লাবণ্য না থাকলে কোথায় যেত ওই অসিত আর শমিতা!

—সেই লাবণ্য নিমন্ত্রিতদের মধ্যে থাকবে না এ ব্যাপারটা লোকচক্ষে কি রকম দাঁড়াবে আপনি বুঝতেই পারছেন! কারণ তখনতো আর ব্যাপারটা গোপন নেই যে লাবণ্য না থাকলে, লাবণ্যর সহায়তা না থাকলে শমিতা আর অসিতের বিয়ে হতই না!

অসিত আর শমিতার বাল্যপ্রেম ছিল। বয়স বাড়ার পর দুজনের খুব কমই দেখা হয়েছে। যতবারই দেখা হয়েছে, দেখা হবার কালটুকু এত সংক্ষিপ্ত যে শমিতার শরীরের দুর্মূল্য স্পর্শটুকু নিয়েই সে বিমুগ্ধ থেকেছে। তাকে কাছে টানা আর আদর করা ছাড়া আর কোনো কিছুই ভাবেনি।

দেখা হলে শরীর আর চিঠিতে সেই শমিতা একেবারে বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসারিকা। ধর ধর ভাব। তোমা বিহনে একেবারে যাই যাই চলে যাই, এমনিতর ধরণ।

কিন্তু বিয়ের পরে অসিত আবিষ্কার করল, আসল শমিতা একেবারে তার চিঠির মতন নয়। সম্পূর্ণ আলাদা একটি নারী।

অন্য, আলাদা, দূর আর নয়।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অসিত একেবারে পাথর হয়ে গেল। এ কী করে বসল সে! তার সমস্ত জীবনটা একটা কঠিন অবুঝ উন্মাদ মেয়ের হাতের মুঠোয়! এক অচেনার কবলে!

লাবণ্যকে নিমন্ত্রিতদের তালিকায় ঢোকাবার জন্য অসিত শমিতাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল।

সত্যি কথা বলতে কি, অসিত শুধু রমণীমোহনই ছিল না, তার ভিতর স্নেহপ্রবণ একটি মনও ছিল। এই বয়সে অমন স্নেহপ্রবণ নরম মন খুব কম ছেলেরই থাকে।

কিন্তু শমিতা অসিতের হাজার অনুনয় সত্ত্বেও কিছুতেই খাটের বাজু থেকে হাত কিংবা অসিতের দিকে মুখ সরালো না।

অসিত শেষ পর্যন্ত তার নিজের সঙ্গে বুঝতে যুঝতে যখন ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ল, শমিতা অখন অসিতের বিছানায় এসে আরো সুন্দর ভঙ্গিমায় শুয়ে পড়ল।

এবং হাজার হোক অসিত পুরুষ। আর শমিতার দেহটা, একটা দামী, প্রশংসনীয় খেলনার মত ছিল। শেষ পর্যন্ত অসিত অনেক ভেবেচিন্তে কৌশলে প্রীতিভোজের অনুষ্ঠানটাই বাতিল করে দিল।

শমিতা কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষমতায় তার কলেজের বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াল। অসিত সেখানে ঠিকই উপস্থিত থেকে পিয়ানো বাজিয়ে গান করল এবং অন্যের গান শুনে বাহবা দিল। কিন্তু তার মন কিছুতেই ভরল না।

পরদিন কি যে হ'ল অসিতের! বিয়ের আগে যেমন যেত তেমনি অফিস থেকে সোজা লাবণ্যদের ওখানে চলে গেল। লাবণ্যদের ওখানে মানেই তো দিদির বাড়ি। দিদির বাড়ি মানেই তো অবারিত দ্বার।

অসিত সেই দ্বার দিয়েই প্রবেশ করলো বটে, কিন্তু যা অনুভব করলো, সে অনুভব এক নতুন আর আলাদা অনুভব।

রোজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় লাবণ্য খাবার ঘরে চায়ের কেতলি, ট্রে এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

নিত্যবৃত্ত বর্তমানের মত সেই অভ্যস্ত দৃশ্যটা তার চোখে পড়লো। অভ্যস্ত অথচ কি দারুণ হৃদয়গ্রাহী! তার সমস্ত অন্তর দিয়ে দিদির বাড়ির সেই আশ্চর্য সুখময় পাতলা পাতলা সৌখীন কাপে লাবণ্যের হাতের তৈরী সোনালী চা খাবার জন্যে তার ভিতরে যে কতখানি কাতরতা তা সেই মুহূর্তে সে মর্মান্তিক ভাবে বুঝতে পারলো। চা এক পেয়ালা তার জুটলো বটে, কিন্তু কোনো আমন্ত্রণ না। নেহাতেই এসে পড়েছে, দাদা-বৌদিদের আত্মীয়, তাই এর বেশি প্রশ্রয় লাবণ্য কোনো ভাবেই দিতে চাইল না।

অসিত গায়ে পড়েই প্রশ্ন করলো, কী ব্যাপার? কথা বলছো না যে?

লাবণ্য নানা ভাবে কথা এড়িয়ে এড়িয়েও শেষ পর্যন্ত যেটুকু বলল তা হলো সে ভীষণ ভাবে চাকরি খুঁজছে। তার ঘাড়ে অনেক বোঝা। ছোটবেলা থেকেই বাবা মা তাকে একরকম নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন। এখন তাঁরা তার ঘাড়ে নিজেদের কিছু কিছু যন্ত্রণা তুলে দিতে চান। লাবণ্যর কাছ থেকে তাঁদের কিছু কিছু অর্থসাহায্য প্রয়োজন। সেটুকু তথ্য লাবণ্য অনেক ভাবে গোপন করতে চাইলেও, শেষ পর্যন্ত কিন্তু না বলে নিষ্কৃতি পেল না। কিন্তু অসিত চলে যেতেই লাবণ্য বুঝতে পারলো সে দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। অসিত এখন বিবাহিত। কি দরকার ছিল তার অসিতের কাছে অত কথা খুলে বলার। পরদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ির একজন নির্ভরযোগ্য দাসীর হাতের চা বানানোর দায়িত্ব দিয়ে লাবণ্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। সুতরাং অসিত এসে লাবণ্যকে পেল না। প্রথম দিন সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো অসিত, দ্বিতীয় দিন আটটা, তৃতীয় দিন ন'টা পর্যন্ত—লাবণ্য বাড়ি ফিরল না।

লাবণ্য আসছে না। লাবণ্য কোথায় ?

ভাবনায় চিন্তায় অসিতের মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। বসে বসে রুগ্ন দিদির মুখে লাবণ্য সম্বন্ধে নানান কটূক্তি শুনতে শুনতে তার কান মাথা ঝালাপালা হয়ে গেল। হতাশ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় মাতালের মত কেমন যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে সে যখন যন্ত্রচালিত আত্মবিস্মৃতের মত তার নিজের বাড়িতে ফিরে এলো তখন বাড়ির সামনের রাস্তা, রাত, গ্যাসের আলো, মাধবীলতা, মাধবীলতা গাছের তলায় অপেক্ষমাণ শমিতা সব যেন তার চোখের সামনে তালগোল পাকাচ্ছে। সে একবার ভাবলো, বরং শমিতাকেই জিজ্ঞেস করা যাক 'লাবণ্য কোথায়' ? লাবণ্যকে সে কবে আবার দেখবে ?

যখন নিজের মানসিক দুঃখের এমনি একটা পিছল কিনারায় অসিত দাঁড়িয়ে, হঠাৎ শমিতা বলল,—রোজ রোজ এতো রাত হচ্ছে, কোথায় যাও বলো তো ?

অসিত পোর্টিকোর বেতের চেয়ারের ওপর ধপাস্ করে বসে পড়ে শুধু বলতে পারল—লাবণ্য।

চিৎকার করে উঠলো শমিতা, বুঝেছি আমি সব বুঝেছি, আমার কপাল পুড়েছে। লাবণ্য, লাবণ্য—ও লাবণ্যই আমার সব শান্তি চিবিয়ে খাচ্ছে। এতই যদি পীরিত, তবে বিয়ে করলে না কেন ওই লাবণ্যকে ?

অসিত কোন প্রতিবাদ করেনি। উঠে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়েছিল।

শমিতা তখনো চেঁচিয়ে চলেছে। একটানা। সত্যি, মেয়েদের এই ঝগড়া-ঝাঁটির সময়ে সব রূপ সব সৌন্দর্য এমন ঝরে যায়, মুড়িয়ে যায়!

—সারাক্ষণ কেবল 'লাবণ্য' 'লাবণ্য' আর 'লাবণ্য'। লাবণ্যের হাত দিয়ে চিঠি পাঠানো। লাবণ্যের মুখ দিয়ে কথা পাঠানো। শুনেছি বিয়ের শাড়িটা অব্দি লাবণ্য কিনে দিয়েছে। ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে সব। কুটি কুটি করে। ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে ওই ড্রেসিং টেবিলের আয়না-টায়না। ওসব নাকি লাবণ্যের পছন্দ করা। তোমার লাবণ্য কি গদীর মধ্যে তুলোর বদলে কাঁটা ভরে দিয়েছিল! নাহলে একদিনও ওই বিছানায় শুয়ে একটা দিনও শান্তিতে ঘুমোতে পারলাম না! একটা মাস পুরো হয়নি, আবার সেই লাবণ্য?

বিয়ের আগের প্রতিটি সন্ধ্যেই তো লাবণ্যর সঙ্গে কাটিয়েছো। কি কথা হতো, না আমার কথা—আমার উপাখ্যান! আহা, আমার কথা বলে ওঁরা নাকি সময় কাটাতেন। বেশ তাই, তাই না হয় বিশ্বাস করলাম কিন্তু এখন কেন—কেন?

অসিত অস্থির হয়ে চিৎকার করে বলেছিল, তুমি চুপ করবে শমিতা, না আমি বাড়ি থেকে চলে যাবো?

শমিতা চম্‌কে তাকালো।

অসিত বলল, তুমি এদিকে এসো, একটু চুপ করে বসো, তোমায় কয়েকটা কথা বলবো।

শমিতা বসল না। কিন্তু চুপ করে দাঁড়ালো।

অসিত আস্তে আস্তে কথা বলতে শুরু করলো, 'দেখো তোমাকে বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি শমিতা, আজ—আজ আবার বলছি, তোমার আর আমার মধ্যে যে পাহাড়প্রমাণ বাধা ছিল, যে ভুল-বোঝাবুঝির অবকাশ ছিল সব কেটে গিয়ে আজ যে আমি তোমাকে পেয়েছি, এর জন্যে যদিও আমাদের ভাগ্যই অনেকখানি কাজ করেছে, একটা কথা সেই সঙ্গে মনে রেখো লাবণ্যও কম করেনি। তোমার আর আমার জন্যে লাবণ্যকে কত বাজে কথা শুনতে হয়েছে, ঘৃণ্য অপবাদ মাথায় তুলে নিতে হয়েছে তা'ও তুমি জানো। তুমি নিজেই তখন তোমার কত চিঠিতে অনুতপ্ত হয়ে লাবণ্যের আত্মত্যাগের কথা কত ফলাও করে লিখেছো, তোমার মনে পড়ে না?

অসিতের গলা আবেগে বন্ধ হয়ে এলো। চাপা গলায় সে বলল, আমরা সবাই রুদ্ধশ্বাস আগ্রহে অপেক্ষা করেছি কবে আমাদের বিয়ে হবে, কবে

লাবণ্যর নামের সব মিথ্যে কলঙ্ক রটনা কেটে যাবে, আমরা আমাদের সংসার সাজাবো, সুখে থাকবো, মাঝে মাঝে লাবণ্য আসবে, আমরা তিনজনে কত আনন্দে সময় কাটাবো! তুমি তো জানো শমিতা, বন্ধু হিসেবে লাবণ্য আমার কতখানি, তবে কেন এমন অবুঝের মত করো?

অসিত কোমল স্পর্শে চমকে দেখলো, শমিতা তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে। শমিতার কণ্ঠস্বর হঠাৎ নরম হয়ে গিয়েছে, আচ্ছা আমি চেষ্টা করবো। কথা দিচ্ছি, লাবণ্যর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে চেষ্টা করবো!

অসিত পরদিন কিন্তু লাবণ্যের খোঁজে তার দিদির বাড়ি গেল। সেদিন তার দিদিই তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন, অসিত; রোজ রোজ তুই লাবণ্যর কাছে আসিস কেন?

—রোজ আসতাম না, যদি একদিনও এসে তার দেখা পেতাম!

—শমিতা আমাকে ফোন করেছিলো···

—শমিতা?

—হ্যাঁ, ফোনে যাচ্ছেতাই করে শুনিয়েছে। আমি নাকি তোর আর লাবণ্যর মেলামেশাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে অবিবাহিত মেয়ের এত ঘনিষ্ঠতা কিসের? অসিত, তোর আর লাবণ্যর সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা না করাই ভালো!

অসিত দিদির ঘর থেকে বেরিয়ে আর কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা নেমে এসে বাড়ি ফিরে এলো। এবং বাড়ি ফিরে এসে ইচ্ছে করেই শমিতাকে সজ্ঞানে মিথ্যে কথা বলল। বলল, সে লাবণ্যর খোঁজে যায়নি। পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে।

পরদিন অফিসে গেল না অসিত।

লাবণ্য একটা স্কুলে কাজ নিয়েছিল।

অসিত গিয়ে সেই স্কুলের পথে দাঁড়িয়ে রইল।

বহুবার অসিত লাবণ্যর সঙ্গে এভাবে দেখা করেছে। ঠিক এমনি। হয়তো গ্যাস্ পোস্টের তলায়, বেথুন কলেজের সামনে। কিন্তু তখন শমিতা ছিল। শমিতার জন্যেই সব। আজ প্রথম অসিত লাবণ্যর জন্য, লাবণ্যর সঙ্গে দেখা করতে দাঁড়াল।

বহুদূর থেকে অসিত লাবণ্যকে দেখতে পেল। লাবণ্য স্কুলের দিকেই আসছিল। মাথায় তার বার্মিজ ছাতা ছিল। কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা।

কেমন এলোমেলো ধরণের লক্ষ্যহীন হাঁটছে। রবীন্দ্রনাথের সেই ক্যামেলিয়ার উপমা কেমন মনে এসে যায়। লাবণ্য অসিতকে দেখেনি। আপন মনেই হাঁটছিল। কিন্তু কেন যেন স্কুল পর্যন্ত এসেও সে স্কুলে ঢুকলো না। আবার ফিরল। হাঁটছে তো হাঁটছেই লাবণ্য। অসিতও ওর পেছু পেছু চলল। খানিকক্ষণ বাদে অসিত লক্ষ্য করলো, লাবণ্য লক্ষ্যহীন ভাবে যে কোনো রাস্তা দিয়ে যেমন তেমন করে হেঁটে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে অসিতের দম ফুরিয়ে এল, লাবণ্য তবুও হেঁটে যাচ্ছে। লাবণ্যর ব্লাউজ ঘামে ভিজে তার পিঠের সঙ্গে লেগে লেগে যেতে দেখল অসিত। অসিতের মনে হলো, প্রখর মধ্যাহ্নসূর্যের তলায় বধ্যভূমিতে এক পাগলিনী ঘুরছে। এখন শুধু ঘাম। আরো ঘুরলে হয়ত তার প্রতিটি লোমকূপ থেকে রক্ত ফুটে বেরোতে পারে।

স্নেহে, করুণায়, মায়ায় অসিত লাবণ্যর কাছে এগিয়ে ডাকলো,—লাবণ্য!

লাবণ্য চম্‌কে তাকালো।

তার ঘর্মাক্ত তামাটে মুখে কি মাখানো ছিলো তা অসিত ঠিক জানে না। নিকষ ভালোবাসার যদি দেহ থাকে, হয়তো শুধু তা লেগে থাকলেই মাত্র কোনো মানুষকে এমন দেখায়।

অসিত লাবণ্যকে নিয়ে কাছের একটা চায়ের দোকানে ঢুকলো।

অসিত সেদিন স্থিরই করে ফেলেছিল যে লাবণ্যকে তার মনের সব কথা খুলেমেলে বলবে। বিয়ের পর যখন সবাই তাদের বন্ধুত্বকে নির্দোষ বলে ধরতে পেরেছে, তখন শমিতা এমন আশ্চর্যভাবে বেঁকে বসলো। ভূত এখন সাক্ষাৎ সরষের ভিতর। এখন অসিত কী করে? তার যে সত্যিকার বন্ধু, মাত্রই বন্ধু, কেবল বন্ধু, তাকে এসব কথা ঠিকঠাক খুলে বলে, অসিত ভেবেছিল সব সময় যেমন চায়, তেমনি পরামর্শ চাইবে।

কিন্তু এখন এই মুহূর্তে! হঠাৎ গরম থেকে ভিতরে কাঠের আধোঅন্ধকার খুপরিতে এসে বসে যখন একটি তামাটে রঙের মেয়ে গল্‌গল্‌ করে ঘামছে, ঠোঁটে রস নেই, চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে, তার মুখের দিকে ঠিক তখনই তাকিয়ে অসিত পরিষ্কার বুঝতে পারলো, শমিতার অভিযোগ অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সে লাবণ্যকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে।

অসিত এখন বিবাহিত। এখন লোকে তাকে আর লাবণ্যকে নিয়ে কিছুই বলছে না। যেদিন তাদের নিয়ে লোকে অনেক কথা বলত, সেদিন তারা বিবাহিত ছিল না, তাদের রাস্তা খোলা ছিল, অসিত অন্ধকার ঘরে হঠাৎ একঝলক

আলো জ্বলার মত, এক্ষুনি এইমাত্র, থাকে থাকে সাজানো সেই সব দিনগুলিতে ভালোবাসা দেখতে পেলো। ভালোবাসা। ভালোবাসা সব সময়েই ছিল।

—কিছু মনে করবেন না সব পুরোনো উপমা।

প্রথমা যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে কথা বললেন।

দ্বিতীয়া এত নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর মুখ দিয়ে প্রায় কথাই সরল না। তারপর তিনি চাপা গলায় বলতে পারলেন,—আসলে, আপনি নিজেই জানেন না গল্পটা কি ভাবে বলছেন আপনি। দুটি মানুষের প্রতিটি যন্ত্রণার মুহূর্তগুলোকে যে কি ভাবে ফুটিয়ে তুলছেন আপনি, যেন মনে হয়,···থাক, এসব কচ্‌কচি রেখে এখন আপনাকে অনুরোধ করি, আবার গল্পটিই আরম্ভ করুন।

একটু হাসলেন প্রথমা,—আপনার নিশ্চয় ক্ষ্যাপা আর সেই পরশ পাথরের গল্পটা মনে আছে? যখন পরশ পাথর তার লোহাকে সোনা করেছিল ক্ষ্যাপা তখন লক্ষ্য করেনি। পরে সেই সোনার শিকল দেখে তার কি যাতনা!

অসিত অনেকগুলো বোঝাপড়ার ধাপ পেরিয়ে এসে লাবণ্যকে বলল,—লাবণ্য! তুমি আমাকে আগে বললে না কেন?

লাবণ্য চুপ করে রইল।

অসিত করুণ গলায় বলল,—তুমি তো আমায় সব বলে দিতে লাবণ্য! কোন্ শার্টের সঙ্গে কোন্ ট্রাউজার পরবো তাও। তুমি তো আমার রুটিন দেখে বই গুছিয়ে দিতে, কোন্ চাকরির জন্যে কোথায় অ্যাপ্লিকেশন্ করবো তার কাটিং কেটে রাখতে লাবণ্য, আমাদের বাড়ির সব পারিবারিক জটিলতার ব্যাপারেও তুমি কতো উপদেশ দিয়েছো, অথচ জীবনের সব চেয়ে দরকারী ব্যাপারে তুমি আমাকে সজাগ করে দিলে না? লাবণ্য, এভাবে কেন তুমি তোমার জীবন নষ্ট করলে, আমার জীবন নষ্ট করলে?

লাবণ্য এত সব আবেগের উত্তরে ভাবলেশহীন মুখে বলল,—অসিত বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে, তুমি কি চা খাবে?

অসিত চায়ের অর্ডার দিয়ে লাবণ্যর টেবিলের ওপর পড়ে থাকা হাতের দিকে তাকালো।

লাবণ্যর শরীর অসিত বহুবার ছুঁয়েছে। বহুবার স্পর্শ করেছে। হাত, কাঁধ গলা কোমরের কথা বলছি না। এমন কি স্তনের সংস্থান, কিংবা উরুও তার অজানা ছিল না। কত দোল, উৎসব, অসুখ, সংঘাত, তাদের দুজনের ওপর দিয়ে গেছে। তারা পিঠোপিঠি থেকে পরস্পরের পরিপূরক।

কিন্তু আজ অসিত আর অবলীলায় লাবণ্যর টেবিলের ওপর পড়ে থাকা হাতের ওপর হাত রাখতে পারল না। লাবণ্যর হাত প্রেমিকার হাত। জ্বলে যায়, স্পর্শে জ্বলে।

—লাবণ্য—আমি কিছু জানি না, জানি না, জানি না, তুমি শুধু আমাকে বলে দাও আমি কি করব ? তুমি যা বলেছ তাই করেছি, তুমি যা বলবে তাই করব।

অসিত দুই হাত মুঠো করে নিজের কপালে রাখল।

লাবণ্য অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা তুললে। তার সারা মুখ যন্ত্রণায় জ্বলছে।

—অসিত তোমাকে আমি উপদেশ দিয়েছি। তোমার জন্য অনেক সহ্য করেছি সত্যি, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি নিজে—না না অসিত, এসব বলা ভাল না। চিরকাল আমি চুপ করে থেকেছি, চুপ করে সয়েছি। আজও সইব। আর একটা কথা, তুমি এখন বিবাহিত। তোমার আমার সঙ্গে এভাবে দেখা করা উচিত নয়। শমিতা জানো তো একটু বেশী ভাবপ্রবণ, তুমি ওর মনে কষ্ট দিও না। আমি যাচ্ছি। আমার পেছনে পেছনে আর এস না। দয়া করো।

লাবণ্য আর ফিরে তাকাল না। শান্ত ভঙ্গিতে সে উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে তার ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিয়ে সে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে চলে গেল। অসিত অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। সমস্ত সময় তার মধ্যে তখন তালগোল পাকাচ্ছে। আপনি ভাবতে পারেন একটা মানুষ যেদিন কোথায় তার ঘর খুঁজে বের করতে পারলে, সেদিনই তার ঘরে ফেরার পথ বন্ধ। একেবারে বন্ধ।

দিনের পর দিন কি যন্ত্রণা সহ্য করেছে লাবণ্য। যাকে ভালোবাসে তার মুখে ক্রমাগত অন্য মেয়ের গল্প শুনতে হয়েছে। তাদের দুজনের ভালোবাসার প্রতিটি মুহূর্তের কাহিনী। চুপ করে শুনেছে লাবণ্য। একটি কথাও বলেনি। একটা ভুরুও কাঁপেনি। কি শান্ত, স্থির। এমন কি অসিত শমিতার চিঠি আর সে চিঠির প্রত্যুত্তরও লাবণ্যকে পড়তে বাধ্য করেছে। লাবণ্যও মাঝে মাঝে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে কতটা লিখলে ভালো, কতটা লিখলে ক্ষতি। বিয়ের আগে অসিত তার জমানো টাকা তুলে লাবণ্যের সঙ্গে ঘুরে বাজার করেছে। শমিতার ব্লাউসের মাপ নিয়ে মেশিনে বসেছে লাবণ্য। নিজে সমস্ত ব্লাউস বানিয়েছে। কারুকার্য করে দিয়েছে। বিয়ের পর কলকাতায় এসে যে ঘরে

প্রথম অসিত আর শমিতা শুয়েছিল সে বিছানা? সে বিছানাও লাবণ্যর নিজের হাতে পাতা।

শমিতা অবশ্য এখন ঘরের ভূগোল পাল্টে দিয়েছে। এমন কি লাবণ্যর হাতের সাজানোর চিহ্নও তার অসহ্য। না, লাবণ্যর সাজানো আয়নায় যত বেশী আলোই আসুক ওখানে আয়না রাখবে না শমিতা। কিছুতেই ওই আলোয় সিঁথি ভাঙবে না, কপালে টিপ্ পরবে না। আশ্চর্য জেদ। নীচতা।

সেখানে লাবণ্যকে দেখুন। সহ্যের প্রতিমা। কি বিষাদ। একা। একা নিজের যন্ত্রণাকে বুকের মধ্যে রেখে দিয়েছে লাবণ্য। কাউকে ডাকে নি। এ অবস্থায় কাউকে কিছু না বলে থাকা যায় না। বড় কষ্ট হয়। কেমন জানেন। বাপ-পালানো সন্তানের মার মত। লাবণ্য একা একা তার শিশুকে গর্ভে পালন করেছে। একা জন্ম দিয়েছে। নাড়ি কেটেছে। এখন ন্যাকড়ায় মুড়ে বা তার ওই ঝোলায় ভরে রোদে নিয়ে ঘুরছে। সে একাই তাকে বড় করবে মানুষ করবে। নিজের পদবীতে পরিচিত করবে, বাবার নাম বলবে না। অসিত চায়ের দোকান থেকে বেরোল।

রোজ নিজের ঘরে তার অবুঝ বউ-এর কাছে ফিরে গিয়ে তবু এক ধরনের সুখ তার প্রাপ্য হত। আজ বড় কষ্ট হল। এ পথ ভাঙা যায় না। আজ আর সে একলা নয়। সে তার অন্তর্দৃষ্টি। তার ভালোবাসা। তার কাঁধে সেই যুক্ত বেদনার জগদ্দল ক্রুশ। সে মুক্ত, নিঃশেষ।

দূর থেকে তার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ঘরে ঘরে আলো। শমিতা হয়ত বিছানায় শুয়ে ফুঁসছে। গেলেই অভিযোগের পুঁটলি খুলবে। কিন্তু আজ শুধু শমিতাকে ভয় নয়। তার নিজেকেও ভয়। আজ হয়ত সে ফিরে জবাব দেবে। চুপ করে থাকতে পারবে না।

'আমি তোমায় ভালোবাসিনি শমিতা। কোনদিন ভালোবাসিনি। সব ভুল। এ বাড়ি, ঘর, খাট, বিছানা, তুমি সব অলীক। মাত্র সত্যি লাবণ্য, আর আমার ভালোবাসা।' যদি শমিতা বলে,—কিন্তু তাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন?

অসিত মনে মনেই মুনের ছিটেয় কুঁকড়ে গেল। আস্তে আস্তে মাধবী লতা-ছাওয়া দরজার বেল টিপলে।

'আমাকে চিরকাল সইতে হবে। চিরটাকাল। এছাড়া আমার উপায় নেই। আমি বিবাহিত। শমিতা আমার স্ত্রী। আমি তাকে সুখী করব, আমি

কিছুতেই তাকে দুঃখ পেতে দেব না।

'কিন্তু লাবণ্য?'

'উঃ!' অসিত অস্ফুট শব্দ করে উঃ বললে। এবং উঃ বলে সে চম্‌কে উঠলো। তার মনের মধ্যে যা হয় হোক, কেউ—কেউ জানছে না। কেউ জানবে না। কিন্তু এইটুকু প্রকাশও চলবে না। এমন কি ওষ্ঠ অধরে শব্দের এই দৈহিক প্রকাশও। অসিত দরজা খুলেই শমিতাকে জড়িয়ে ধরলে।

শমিতা অবাক।

—কি রান্না করেছ?

—ঠাকুর জানে।

—নষ্ট হোক রান্না, চলো আমরা বাইরে কোথাও ডিনার খাব, তার পর সিনেমা যাব। দ্যাখো তো শমিতা কাগজটা, কি যেন একটা ভালো ছবি হচ্ছে মেট্রোতে।

শমিতার শাড়ি বেছে দিলে অসিত। বুকে পাউডার দিয়ে দিলে। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল শমিতাকে।

শমিতা, জানেন, ভীষণভাবে মেয়েলী ছিল।

প্রথমার গল্পে বাধা দিয়ে দ্বিতীয়া বললেন, কেমন মেয়েলী বলব? আমার মনে হয় তার রং ছিল হলুদ, কোমর একুশ ইঞ্চি, সম্ভবতঃ তার নিতম্ব খুব সুগঠিত ছিল, সম্ভবতঃ বুক বন্ধুর। হয়ত তার গালে একটা বড় তিল বা চোখের ওপর জোড়া ভ্রূ থেকে থাকবে। কিন্তু তার ঠোঁট নিশ্চয়ই অদ্ভুত সুন্দর ছিল। ফুল্ল, রসাক্ত।

—আশ্চর্য, আপনি প্রায় ঠিক বলেছেন। শমিতা খুব সুন্দর করে সাজলে সত্যিই তার দিক থেকে চোখ ফেরানো যেত না। অসিত শমিতার পাশে পাশে খুব তৃপ্তির সঙ্গে নিউক্যাথে থেকে ডিনার খেল। মেট্রোয় ছবি দেখল। রাত্রে বাড়ি এসে শমিতাকে কেন্দ্র করে অনেকক্ষণ জেগেও রইল। এ কথা মিথ্যে নয় যে ডিনার খাবার সময় অসিতের একটু, এক ফোঁটাও ভালো লাগেনি বা সিনেমার সেলুলয়েড থেকে কোনো গল্প আসেনি চোখ-কান চোলাই হয়ে তার মনের ভিতর, বা তার দেহ শমিতার দেহের সংঘর্ষে এসে কোন স্ফূর্তি পায়নি। কিন্তু সারাক্ষণ সেই আশ্চর্য মস্তাজ তার সব কিছুর সঙ্গে সমানে ঘুরেছে। সেই ধু ধু রোদ। সেই লাবণ্যর ছায়াময়ী মূর্তি। তার বুকে সেই অসহায় পিতৃহীন ভালোবাসা।

এবার আপনাকে যা বলব তা হ'ল আমার বান্ধবী লাবণ্যর পাপের গল্প। গল্প বলব তার কারণ এ সে পুণ্য যে পুণ্য পাপের অধিক। একটি বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে একটি অবিবাহিত মেয়ের ভালোবাসা আমি জানি, শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে আহ্বান করে নেবার জন্য কেউ তৈরী থাকে না। লাবণ্য তা জানত। অসিত তা জানত।

অসিত পুরুষ। সে একটি ছিদ্রপথ পেয়েছে। সে নিঃসংশয় লাবণ্য তাকে ভালোবাসে। তাছাড়া তার সাংসারিক জীবন সুখের নয়। ভবিষ্যতে কোনো-দিন সুখের হবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। লাবণ্যর অপরিসীম ভালো-বাসা তাকে কেন ভীষণভাবে আকর্ষণ করবে না বলুন। কিন্তু লাবণ্য? শান্ত, স্থির, ঠাণ্ডা, নিষ্কাম লাবণ্য। সে মেয়ে। অসহায়। আশ্রয়হীন। তার সংযমের প্রয়োজন ছিল। কেউ তাকে বলেনি ভিতরে যা তাকে চৌচির করছে তার সব রক্ত দেখাতে। লাবণ্য অসিতের কাছে অপার্থিবা ছিল। লাবণ্যের সেই অপার্থিবতাই তাকে ভুলের ফ্রেমে দেবীর ছবি করে বাঁধিয়ে রেখেছিল। অসিত হঠাৎ তাকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলে দেবীর মুখে কিছু বিন্দু বিন্দু মানুষী স্বেদ। বুকে অল্প অল্প স্পন্দন।

আমি বলব অসিতই দোষী। শমিতাকে মিথ্যে কথা বলতে তার আর কোনো দিনও বাধেনি। অফিস কামাই করে প্রায় প্রতিদিনই লাবণ্যের স্কুলের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। লাবণ্য বহুদিন বাধা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত পারেনি। মুখে বলা যায়, কাজে পারা যায় না। এইখানেই লাবণ্যের পাপ। তারপর সমাজ সংসার শত শত আইনসঙ্গত চোখের ভয় থেকে দুজনে পালিয়েছে। কোনো মাঠে কোনো গাছের তলায় গিয়ে বসে দুজনের দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'এ অন্যায় এ পাপ'। কিন্তু চোখের দৃষ্টি যেই মিলেছে তখন কোথায় অন্যায় কোথায় পাপ।

আস্তে আস্তে সেই ভুলের ফ্রেমে বাঁধানো দেবীর মূর্তি ছবির সমতল থেকে উঁচু হয়ে উঠেছে। একস্তর থেকে দ্বিস্তর, তারপর ত্রিস্তর। লাবণ্য মানুষের ডাইমেনসন পেয়ে গেছে। সবার অজান্তে। কখন তা দুজনেই জানতে পারেনি। অসিত লাবণ্যকে একদিন বৃষ্টির সন্ধ্যায় বুকের খুব কাছে হঠাৎ পেয়ে গিয়ে দেখেছে তারও শরীরে মানুষের মত গন্ধ, চুলে জীবন আছে। শমিতার পাশে শুয়ে অসিত কত অবলীলায় লাবণ্যকে ভেবেছে। প্রতিবার যখনই তাদের দেখা হত সবটা অসিতের উদ্যোগে। ব্যাপারটা লাবণ্যের পক্ষে কতখানি যন্ত্রণাদায়ক

আশা করি বুঝতে পারছেন। সে তো অসিতকে কিছুতেই মুখ ফুটে আসতে বলতে পারে না। ভাবুন খাঁচায় একটা বন্ধ প্রাণী বসে আছে। তাকে যে খাদ্য দেয় সে ইচ্ছামত আসে। এলেই তবে সে খাদ্য পায়। খাদ্যদাতার প্রয়োজনে। তার নিজের প্রয়োজনে না। খিদে পেলে তার মুখ ফুটে চাইবার কোনো অধিকার নেই। সেটা সঙ্গত নয়। পাপ।

কিন্তু এখন অসিত আর তার মধ্যে কোনো আড়াল বা শমিতা-প্রসঙ্গের অজুহাত নেই। কেন অসিত তার কাছে আসে, তাকে না দেখে থাকতে পারে না সে জানে। অসিত কথার পর কথা বলে যায়। নিরুপায় চাবুক খাওয়া বাঁধা পশুর মত কথা বলে যায়। লাবণ্য শোনে। অসিত একজন সুন্দর পুরুষ। তার সাদা সুন্দর পুরুষালী শরীর, শ্যাম্পু ফুরফুরে চুল, সুন্দর চোখ, পুরন্ত ঠোঁট, দাড়িকামানো সবুজাভ গাল, সুগঠিত গলা—এমন কি গলার টুঁটির সামান্য পুরুষালীর উচ্চতা, লাবণ্য যে সব দেখত।

এই শার্টের আড়ালের সুন্দর রক্তাভ বুকে সে কোনো দিন মাথা রাখতে পারবে না। এই ঠোঁট, এই পুরুষ বাহু তার জন্য না। প্রতি রাত্রেই তার করে দিয়ে আসা বিছানায় শমিতা আর অসিত শোয়। লাবণ্যর বুকের ভিতর অসহ্য জ্বালা উঠত। লাবণ্যও মাঝে মাঝে মানুষী ভাষায় সে-সব না প্রকাশ করে পারেনি।

অসিতের সঙ্গে যখনই তার দেখা হয়েছে সে রুক্ষ ভাষায় অসিতকে শুধু ভৎর্সনা করেছে।

—আমাকে একা থাকতে দিচ্ছ না কেন? আমার দুঃখ নিয়ে আমি তোমার কাছে যাইনি তো। এভাবে বার বার দেখা হওয়া, কেউ যদি একদিনও দেখে ফেলে? কি উত্তর দেবে তুমি? কি কৈফিয়ৎ? তুমি পুরুষমানুষ যদি বা তোমার অপরাধ মাফ হয়, কিন্তু আমার? আমার অপরাধ তো কেউ মাফ করে দেবে না।

অসিত সব শুনত! চুপ করে শুনত। লাবণ্য বড় নিরুপায়। এমন কি তার নিজের যন্ত্রণাও প্রকাশ করে জানাবার উপায় নেই। চোরের মার মত তাকে চুপি চুপি কাঁদতে হয়। মাত্র অসিতের কাছে। লাবণ্যর এই রুক্ষ কথা-গুলোর ভেতরও যে একটা চিন্‌চিনে সুখ আছে। এত রাগ এত ক্ষোভ যে সমস্ত অনুক্ত ভালোবাসার কথাও বলে দেয়।

সেদিন অসিত লাবণ্যকে স্কুলে যেতে দেয়নি। দুজনে গিয়ে বসেছিল

আলিপুরের কাছাকাছি একটা বাগানে। কেউ কোথাও নেই। ওপরে সূর্যের আলো আর পাতার ঝিলিমিলি। লাবণ্যর সমস্ত শরীরটা সেই ছায়ায় নড়ছে। খানিকটা দূরে জল চিকচিক্ করছে মাঝখানে কিছু ঘাস নড়ছিল। কচিৎ এমন হয়। মানুষের জীবনে এই সব মুহূর্ত কখনও কখনও আসে। সব সময়েই সঙ্গে থাকা দুঃখ হঠাৎ উঠে এসে সমস্ত প্লাবিত করে দেয়। প্লাবিত করে দিয়েছে যে তার প্রমাণ তখন চারপাশের সমস্ত বস্তু সমস্ত প্রকৃতি সেই দুঃখের আলোকে তর্জমা করে নেয়। আপনার মনে হবে টেবিলের পাশে ধুলোর মধ্যে রাখা কেরোসিনের বোতলটার গড়নেও কি অদ্ভুত কারুণ্য রয়েছে। বিছানার ধারে রাখা রবীন্দ্র রচনাবলী যেন সহানুভূতির একটা আয়ত আকার।

সেদিন লাবণ্য আর অসিতের বোধ হয় তাই হয়েছিল। ঘাসগুলি নড়ছে যেন দুঃখ, রোদ্দুরের মধ্যে, শুষ্ক কঠিন কাউকে জানতে দেব না, এমনি একটি কান্না।

—আমারই চোখের ওপর ? আমার চোখের ওপর তোমরা দুজন !

অসিত শেষ পর্যন্ত বললে,—তুমি বিশ্বাস কর লাবণ্য,আমি বার বার দিদিকে বলেছি তোমাদের বাড়ী যাব না, যাওয়া সম্ভব না, দিদি কিছুতেই শুনবে না। দিদি বলছে বিয়ের পর থেকে আমি আর শমিতা কোনো দিন একসঙ্গে দিদির কাছে আসিনি। থাকিনি। অন্তত দিনসাতেক থেকে যাওয়া উচিত। শমিতাও ভীষণ আগ্রহ দেখাচ্ছে। কিছুদিন হল দারুণ সদ্বুদ্ধি হয়েছে। ও তোমার সঙ্গে মিশতে চায়। কি করব বলো আমাকে রাজী হতেই হয়েছে।

—হতে তো হবেই ! তুমি সবার কথাতেই রাজী হবে। যেদিন শমিতার সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে চেয়েছিলাম সেদিন আমাকে তোমরা কেউ মিশতে দিলে না। সেদিন শমিতা আমাকে যে ভাবে অপমান করেছে তার তুলনা আছে ? অসিত, হাজার হোক আমিও তো কিছু এমন বৃদ্ধা ত্রিকালজ্ঞা নই। আমিও তো প্রায় শমিতার বয়সীই। তুমি তার কাছ থেকে জামায় একটা বোতাম পরানো পর্যন্ত আশা করো না অথচ আমার কাছ থেকে তোমার কত আশা তুমি আর শমিতা যে সাতদিন অজয়দাদের বাড়ি থাকবে, সে সাতদিন আমি আমার বাবা মায়ের কাছে চলে যাব। কিছুতেই থাকতে পারব না।······দেখতে পারব না।

অসিত লাবণ্যের হাত চেপে ধরল।—লাবণ্য, লাবণ্য—কথা শোনো। যেও না। আমার জন্য অনেক অনেক সহ্য করেছ। এটুকুও কর।

লাবণ্য তার দু'হাতের মধ্যে সেইদিন প্রথম ভেঙে পড়ল। সেদিন লাবণ্য

কিছুতেই বাধা দিলে না। অসিত তাকে অনেক কাছে টেনে নিলে। সেই বাগান যখন বন্ধ হবার সময় এলো তখন সন্ধ্যে পাঁচটা। ছায়াচ্ছন্ন বাগান থেকে বেরিয়ে এসে দুজনে চা খেয়ে, তারপর ডায়মণ্ডহারবারের বাসে চড়ে বসল। সেখানে সন্ধ্যের হু হু করে হাওয়ায় সেই হিংস্র জলের ধারে বসে অন্ধকার, স্টীমারের আলো দেখার পরে যন্ত্রণা সামান্য কাটলো, ফেরবার সময় ট্যাক্সি নিলে অসিত। লাবণ্য জীবনের প্রথম চুম্বন সে যার কাছ থেকে চেয়েছিল তার কাছ থেকেই পেয়ে গেল।

সেদিন রাত্রি প্রায় দশটায় লাবণ্য যখন একেবারে ভরপুর টলতে টলতে বাড়ি ফিরল তখন ঔচিত্য আর অনৌচিত্য জ্ঞান তার একেবারে ঘুচে গেছে। বিছানায় নিজেকে ফেলে দেবার পর সারারাত সে কী ভীষণ নির্লজ্জের মত যতবার ঘুমোল, যতবার জেগে উঠল, ততবার তার সঙ্গে অসিত।

তারপরই শমিতা আর অসিত লাবণ্যর অজয়দাদের বাড়ি সপ্তাহ কাটাতে এল। লাবণ্যের সেই প্রথম মনে হল সে এই বাড়ির মালিকের সম্পর্কিত বোন না। বিনা পয়সার নার্স, নার্সও না। মেড্।

কিন্তু যা হয়, অভ্যস্ত হাতে কাজ পড়লে মন না থাকলেও কাজ হয়ে যায়। লাবণ্য অসিতের পছন্দ ভালো লাগা সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ চিনত। পর্দার রং যদি শ্যাম্পেন হয়, বিছানার চাদর হবে রোজ্ পিঙ্ক। ঘরে শাঁখ জাতীয় কোনো জিনিস থাকবেই। সমুদ্রশঙ্খ হোক, নিদেন কড়ি বা ঝিনুক। কোথাও খুব স্বচ্ছ পর্দা একখানা থাকবেই, ঘুম থেকে উঠে অসিত মাটিতে পা রাখতে পারে না। কালো লোমের বেড্সাইড কার্পেটটা লাবণ্য তার সৌখীন জিনিস সঞ্চয়ের বাক্স থেকে বের না করে পারলে না। রজনীগন্ধা অসিতের পছন্দ না, লাবণ্য বাগান খুঁজে কামিনী আনলে।

শেষ পর্যন্ত চাকাওয়ালা চেয়ারে বৌদিকে বসিয়ে ঘরটা একবার দেখিয়েও নিয়ে গেল।

লাবণ্য হাসলে। কেউ বুঝবে না জানবে না সে কত নির্লজ্জ হয়েছে। মাত্র অসিত ছাড়া। অসিতের মনের মত করে ঘর সাজাতেও একদিন লাবণ্যের কত ভয় ছিল। অসিতের মনের মত রান্না করতেও। আজ সে কিছুই মানবে না। ঠিক অসিত যা যা ভালবাসে তাই-ই রাঁধতে দেবে। অজয়দার পছন্দ বৌদির পছন্দর একটা পদও না। শমিতার পছন্দের মত তো নয়ই।

লাবণ্য ঘর সাজিয়ে রান্নাঘরে গেল। রান্নাঘরের কাজ শেষ করতে

করতেই অসিত শমিতা এসে গেল। লাবণ্য স্নান করতে যাচ্ছিল, তাকে একটু দাঁড়াতেই হল সিঁড়ির মুখে। মুখে হাসি মাখিয়ে লাবণ্যও অজয়দার গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

শমিতা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ঘনিষ্ঠ গলায় বললে, লাবণ্য আজ তোমার স্কুলে যাওয়া চলবে না।

লাবণ্য হেসে বললে, আজ আমার স্কুলই নেই।

লাবণ্য সেদিন স্নান করতে অনেক সময় নিলে। বাথরুমে টবের ভিতর শুয়ে সে তার নিজের শরীর দেখতে পাচ্ছিল। এভাবে শরীর দেখার মধ্যে একটা বিলসন আছে। যে সব স্নানঘরে শরীর দেখবার কোনো সুপ্রকট ব্যবস্থা নেই সেখানে শরীরের জন্য এত মমতা এত কষ্টও থাকে না। লাবণ্যর বাপের বাড়ির এজমালি কলঘরে যেসব মেয়েরা স্নান করতে যায় তারা খুব একটা শরীর দেখে না। কবে ঘাড়ে ময়লা পড়ে গেল, কটিতে কষির দাগ। পেট তাল পাকিয়ে উঁচু হয়ে গেল। স্তন ক্রমশ নিম্নমুখী এসব দেখা হয়ে ওঠে না। শরীর নিয়ে ভাববার সময় না থাকলে মানুষ কম স্বার্থপর হয়, দিতে দিতে দেয়ার সীমা ভুলে যায়। কতটা দিলে বাথরুমের আয়নায় আর চোখের কোলে কালি দেখতে হবে না এ কথা তাকে পীড়া দেয় না। অজয়দার এই দামী বাড়ির অসাধারণ ফিটিংস দেওয়া বাথরুমে লাবণ্য আজ ভীষণ স্বার্থপর হয়ে গেল।

দ্বিতীয় চিন্তায় শরীর দেখতে লজ্জা হল তার। একটি পুরুষের চোখে তার শরীর কেমন লাগবে ভাবতেও লাবণ্যর গা শিরশির করে উঠল। সে তার অপুরস্ত শরীরের লজ্জায় জলে অনেকক্ষণ উপুড় হয়ে থাকল।

লাবণ্য সাধারণতঃ সাজত না। সেদিন লাবণ্য ছোট্ট ছোট্ট কালো কল্কা ছাপা দেওয়া শাদা পাতলা শাড়ি পরলে। মাথায় ফুল দিলে, এমন কি কপালে টিপটিও। লাবণ্য গন্ধ মাখতে ভারি ভালোবাসত। কিন্তু সে রাত্তিরে। একা একা আজ লাবণ্য নিজেও গন্ধ মাখলে।

লাবণ্য যখন গাড়িবারান্দায় বেরিয়ে এল তখন অসিত শমিতা অজয়দা বসে আছে। বৌদিও তাঁর চাকাঅলা চেয়ারে মাথা হেলিয়ে শুয়ে।

লাবণ্য জানত তাকে যদি খুব সুন্দর দেখায় অসিত কিছুতেই তার দিকে তাকাবে না। অসিত তাকাল না। শমিতার পাশে বসল। শমিতা কিন্তু তাকে দেখেই সিঁটিয়ে গেছে। লাবণ্যকে বলে দিতে হল না শমিতার ভাবান্তর কেন ঘটল।

আসলে শমিতা প্রথম যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল লাবণ্য যে এতখানি কাম্য তা চট্ করে বুঝতে পারেনি। শমিতা এখন লাবণ্যকে ধারালো ঝকঝকে অস্ত্রের মত দেখতে পেয়েছে। তার সারা অঙ্গ জলে গেল। লাবণ্য যখন তার হাত ধরে হাতের আংটিগুলির কারুকার্য দেখছিল, আসলে অসিতের খুশির জন্য শমিতার সঙ্গে ভাব জমাতে চেয়েছিল সে—শমিতা হাত ঝাড়া দিয়ে ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল।

তার নাকি ভীষণ মাথা ধরেছে। লাবণ্যও উঠে দাঁড়ালো শমিতার সঙ্গে। শমিতা কি রকম অদ্ভুত গলায় বললে,—না না তুমি বসো, তুমি তোমার অতিথিকে এন্‌টারটেন্ করো।

শমিতা চলে যেতেই বৌদি ঠোঁট বাঁকালেন।—একেই বলে বড়লোকের আহ্লাদী মেয়ে। বাব্বা, কি করে মেজাজ বুঝে চলিস অসিত ?

অসিত গুম হয়ে বসে রইল। অজয়দা আবহাওয়াটা হাল্কা করতে বলে উঠলেন, লাভ-ও ম্যারেজের বউ, তায় আবার নতুন প্রেমের নতুন বধূ, আগা-গোড়া শুধুই মধু, কি বলো ব্রাদার ?

অসিত বললে, হ্যাঁ, ও একটু মুডি।

লাবণ্য কেমন যেন ঝলসে গেল। শমিতা লাবণ্যকে প্রায় অপমান করেই যখন উঠে গেল, লাবণ্য বলছে না যে অসিত তার জন্য শমিতাকে অপমান করুক, অন্তত অসিতের মুখের একটা পেশীও যদি একটু কাঁপত, একটু শক্ত হত চোয়ালটা মাত্র, সেটুকুও যদি লাবণ্য বুঝতে পারত! কিন্তু অসিতের মুখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়েছিল লাবণ্য। কোনো কিছুই দেখেনি। আবার শমিতাকে সায় দিয়ে অসিত বলল, ও একটু মুডি···মুডি···। মুড মাত্র শমিতারই শোভা পায়। লাবণ্যর না। লাবণ্যের মুড্ হতে নেই। লাবণ্য আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে ফেললে, অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে সামলানোর পরে সে উঠে গেল শমিতাকে ডাকতে। খাবার জায়গা হয়েছে। শমিতা তখন বালিশ কামড়ে পড়ে। লাবণ্য কিছুতেই তাকে তুলতে পারলে না। অজয়দা অফিসে গেলেন। বৌদি তাঁর নিজের ঘরেই খাওয়া সারলেন। অসিত অনেকক্ষণ শমিতাকে খোসামোদ করলে। শেষ পর্যন্ত অসিত নীচে নেমে এলো।

—লাবণ্য, দাও খেতে দাও, ভীষণ খিদে পেয়েছে।

লাবণ্য উঠল।

—দেখুন ভালোবাসার নাম করবেন না। এমন 'সকল অহঙ্কার হে আমার

ডুবাও চোখের জলে', বস্তু আর কোথাও নেই।

ডাইনিং রুমের সেই আধো অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরটিতে অসিতের সামনে নির্মল শাদা কাঁচের থালায় ভাত বেড়ে দিতে দিতে লাবণ্যের চোখে জল এল। মনে মনে নিরুপায় ভাবলে, আমি তো এমনি করে তোমাকে খাওয়াবার জন্যে জন্মে-ছিলাম। লাবণ্য অভ্যস্ত হাতে তরকারির মাছ মাংস ভাজা তুলে তুলে দিচ্ছিল অসিতকে। আপনি মনে মনে হাসছেন। জানি এতদিন পরে ফের ফিরে ঘুরে কল্কা শাদা ছাপা শাড়ি পরিয়ে শরৎচন্দ্রীয় নায়িকাকেই আপনার সামনে দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, এ কথাটা মনে হওয়া স্বাভাবিক আপনার পক্ষে···।

—কথাটা মিথ্যে নয়। ইচ্ছে করে যে। যাকে ভালোবাসা যায় তার জন্যে সব সময় একটা কিছু করি এমনি ইচ্ছে হয়ই। হওয়াও যে ভীষণ স্বাভাবিক।

লাবণ্য অসিতের সামনে তার খাওয়া দেখছিল। থেকে থেকে তার পুরানো দিনের অনেক ঘটনা মনে পড়ছিল। অসিত যখন শমিতার কথা বলত, অসম্ভব সব স্বপ্ন দেখত, তখন কতদিন অসিত লাবণ্যকে বলেছে—আমার কি ইচ্ছে করে জানো লাবণ্য? অফিসে যাবার সময় আমার বৌ লালপাড় শাড়ি পরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি যেতে যেতে যতবার পিছন ফিরে দেখব ততবার দেখতে পাবো। আর সারাদিন পর অফিস থেকে আসার সময়ও আমার জন্য চুল বেঁধে টিপ পরে গা ধুয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে সে। আমি যখন খেতে বসব, আমার সামনে বসে না থাকলে আমি খাবোই না। যেখানেই যাই যত জনের মধ্যেই থাকি সে কিন্তু ছুতোয়নাতায় আমার খাওয়ার সামনে হাজির থাকবেই। রাত্রে যখন কাছে শোব তার গায়ে অন্তত হাত ছুঁয়ে থাকব। তা নাহলে ঘুমোতেই পারব না। সত্যি, কতদিন শমিতার সঙ্গে দেখা হয় না। কবে যে তাকে এত কথার বলবার সময় পাবে।

আজ লাবণ্য তার সামনে বসে তাকে খাওয়াচ্ছে। শমিতা নেই। কিন্তু লাবণ্য তার বৌ না। লাবণ্য কোনো দিন তার বৌ হতে পারে না। তবে কেন মাত্র কয়েকটা বিষয়ে লাবণ্য তার বৌ-এর মত হবে। যেখানে বৃত্ত পূর্ণ হবে না, ফাঁক থাকবে, কয়েকটির জন্য শমিতা সেখানে লাবণ্য কেন হতে যাবে? এ যে ভীষণ দীনতার শর্ত।

লাবণ্য নির্নিমেষ চোখে অসিতকে দেখছিল। অসিত লাবণ্যকে। দুজনেই বুঝতে পারছিল মাঝখানে টেবিল বলেই নয়; ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাসে তারা

পরস্পারের অচ্ছ্যুৎ। তখনই শমিতার কণ্ঠস্বরে খেয়াল হল তাদের,—কৈ খাচ্ছ না কিছু, লাবণ্য এসো, আমরাও খেয়ে নিই।

তার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য নরম।

লাবণ্যর আপনা থেকেই মাথা নীচু হয়ে এলো। সে অনধিকারী। অধিকারী এলেই তাকে কেমন বেত্রাহত কুকুরের মত পেছু হটতে হয়। শমিতার সঙ্গে খেতে হল তাকে। সমানে গল্প করতে হল। আবার শমিতার মুড ফিরে এসেছে তাহলে। গল্প করতে ক্ষত আরো বাড়ল। রক্তারক্তি হতে লাগল ভিতরে ভিতরে, লাবণ্য তবু প্রাণপণ চালিয়ে গেল। সন্ধ্যায় সিনেমা দেখা পর্যন্ত হাসিমুখে সেরে রাতের খাওয়ার আসরে হৈ হৈ করে লাবণ্য যখন বৌদিকে ওষুধ দিয়ে, অসিতের ঘরে ইলেকট্রিক কেটলি কফি জল রেডি করে নিজের ঘরে বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালে তখন তার মনে হল তার মেরুদণ্ড নরম হয়ে গেছে। একটা মাংসের থস্‌থস তাল হয়ে লাবণ্য মাটিতে স্তূপাকার হয়ে পড়ে গেল। পড়ে গিয়ে তার অদ্ভুত হাসি পেল। সে এভাবে কোনদিন বন্ধ দরজার ওপাশের ঘরগুলোকে ভাবেনি। আজ ভাবলে। অজয়দার এই বিশাল বাড়ীর এতগুলো ঘরের দরজা এখন ভিতর থেকে বন্ধ। ভিতরের মানুষরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। করেও। কে দেখতে যাচ্ছে। অজয়দা, বৌদি, অসিত, শমিতা।

মনে মনে নানা গুন গুন করে লাবণ্য।

'আমি এখন আমার ঘরে, এইখানে, এই চৌকাঠের পাশে, যেখানে মানুষ জুতো ছেড়ে রাখে সেই ধুলোয় এমনি স্তূপাকার পড়ে থাকি, বিছানায় না যাই, ব্লাউসের বোতাম খুলে এই বুক ঠাণ্ডা মেঝেয় রাখি, সারারাত মাটিতে মুখ রগড়াই, অস্ফুট জ্বালায় মাতালের মত রবীন্দ্র সংগীত গাই, যদি আমি ব্লেড দিয়ে কব্জির শিরা কাটি বা স্লীপিং বিষ খাই তাহলে কে দেখতে যাচ্ছে। কেই বা আমাকে বাধা দেবে।

আমি এখন দু হাতে আমার কান বন্ধ করব। অসিত শমিতার ঘর আমার ঘরের পাশেই। দেয়ালটা অনেক পুরু। যথেষ্ট পুরু। যেন চুমুর শব্দ শুনতে না পাই। যেন ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ কানে না আসে। ওদের দাম্পত্যকাকলী আমি শুনতে পারব না। সকালবেলা অসিতের গালে যদি সিঁদুর লেগে থাকে! আয়া গিয়ে বিছানা না ঝেড়ে দিলে ও ঘরে কিছুতেই ঢুকবো না আমি।'

যারা মড়া পোড়াতে যায় তাদের অনেক সময় মড়া কোলে করে কাটাতে হয়। লাবণ্য সারারাত তার পাশের ঘর কোলে নিয়ে বসে রইল। ঈর্ষার জ্বালায়, নিরুপায়তায় জর্জর হয়ে ভোর এল।

আপনি দেখেছেন অনেক সময় চোর চুরি করতে এসে আর পালাতে পারে না, আটকে পড়ে? সারারাত তার হাতে কোন অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা এই ভয়ে কেউ তার কাছে যায় না। যেই সকাল হয় তখন সবাই গিয়ে দূরে থেকে ঢিল ছোঁড়ে। ভয়ঙ্কর ভোর তেমনি করে লাবণ্যর কাছে এলো। লাবণ্য আয়নার সামনে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু তাকে আয়নার সামিল তো হতেই হবে। চোখের কোলে কতটা কালি পড়ল এ হিসেব যদি সে নিজে না রাখে তাহলে অন্যে রাখতে আরম্ভ করে দেবে! চোখের কোলে যতটা কালি পড়বে ঠিক তার সঙ্গে ততটা পাল্লা দিয়েই লাবণ্যকে হাসতে হবে। সেদিন সকালেও লাবণ্যকেই অসিতের খাওয়ার সময় থাকতে হল, শমিতা তখন বিছানা ছেড়ে ওঠেইনি। আটটার আগে সে উঠতেও পারত না। অথচ অসিত বেরিয়ে যাবে দশটায়। লাবণ্যকেই স্নানের সময়কার তোয়ালেটি, খাবার সময় অসিতের হাতে ভাজা মশলাটুকুও গুঁজে দিতে হল। শমিতা তখন উঠেছে বৈকি। কিন্তু তার বাপের বাড়ী থেকে আনা অভ্যাস অনেকক্ষণ ধরে স্নান, মুখ ধোয়া, সব ওপরের স্নানঘরে সেরে অপূর্ব সুন্দর নিখুঁত সেজে বেরুতে বেরুতেই বেলা দশটা কাবার।

শমিতার সঙ্গে দুপুরে মার্কেটিঙে বেরুতে হল লাবণ্যকে। সেখান থেকে শমিতা তার কোন এক মাসতুতো বোনকে পেয়ে গেল। লাবণ্যর হাতে কেনা মালপত্র গুঁজে দিয়ে শমিতা বোনের সঙ্গে চলে গেল। লাবণ্যকে বলে গেল রাত্রে খেয়েদেয়ে অজয়দাদের বাড়ি ফিরবে।

লাবণ্য যেন রেহাই পেল। সারাক্ষণ এভাবে মুখোশ গলিয়ে রাখা সত্যি অসম্ভব খারাপ লাগে। অন্ততঃ আজকের এই সন্ধ্যাটুকুও সে সহজ হয়ে থাকতে পারবে। ইচ্ছেমত পথে পথে বেড়াতে পারবে বা নিজের বিছানায় শুয়ে একা একা মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকতে পারবে।

সেদিন সন্ধ্যার মধ্যে, জানেন, ভাগ্যের একটা ষড়যন্ত্র ছিল। নইলে আকাশ ভেঙে অমন বৃষ্টিই বা পড়বে কেন? লাবণ্যকে আর মেনু বাতলে দিতেও রান্না-ঘরে যেতে হল না। অজয়দা অফিস থেকে এসেই খিচুড়ি আর ডিমভাজার ঢালাও অর্ডার দিয়ে রেখেছেন। লাবণ্য বাড়ি এসে শমিতা যে আজ ফিরছে

না এ কথা জানিয়ে, কিছু খাবে না জানিয়ে, যেন তাকে বিরক্ত না করা হয় জানিয়ে, বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল।

আগের সারারাত ঘুম হয়নি। সারাদিন, সারাদুপুর কাজ করেছে, ঘুরেছে—লাবণ্য ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। অসিতের আঙুল কটি সবেমাত্র তার পিঠ ছুঁয়েছে।

জানালার ঘষা কাঁচ দিয়ে ভিতর-বারান্দায় সারারাত যে কম পাওয়ারের আলো জ্বলে তারই আধো অন্ধকারে অসিত হাঁটু ভেঙে লাবণ্যর বিছানার পাশে বসল। লাবণ্য উঠে বসল। সে কোনো কথা বলতে পারছিল না। সে যে মনে মনে এই চায়। আবার চায়ও না। এ যে অন্যায়। পাপ। অসিত তার হাতের আঙুল কটি লাবণ্যের উরুতে রাখল। লাবণ্যর মনে হল তাপে উরু পুড়ে যাচ্ছে। সে খুব ধরা গলায় বললে, এখন রাত কত ?

অসিত রেডিয়ম ডায়ালের রিস্টওয়াচ ঘুরিয়ে দেখে বললে,—বারোটা। শমিতা আসতে পারেনি বলে একা লাগছে ? শমিতা ফোন করেছিল। ও আজ রাতটা মঞ্জুদের ওখানেই কাটাতে চায়।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল লাবণ্য।

—তুমি এলে কেন অসিত ?

—কাঁদতে।

তারপর আর কথা ছিল না। কথা বলবার দরকার ছিল না। জলে ডুবে যেতে যেতে আকুলি-বিকুলি হঠাৎ বাতাসে নাক ভাসানোর যে মুক্তি সেই মুক্তিতে অসিত লাবণ্যর হাঁটু বেয়ে উঠে এসে তাকে নিঃশেষে জড়িয়ে ধরলে।

যদি অসিত লাবণ্যকে বলত 'তোমায় ভালোবাসতে এসেছি, আদর করতে এসেছি, নিজের কথা বলতে এসেছি'—হয়ত এমন হত না! হয়ত অনেক পরে এমন হত। কিন্তু 'কাঁদতে' এই একটি নিরলংকার কথায় মনের মূল তার কটি একসঙ্গে ঝনঝন করে বেজে উঠে সহসা এক ঐক্যতানের সমে চলে গেল।

সেদিন রাতের মত এর চেয়ে বেশি গর্হিত কিছু বোধ হয় লাবণ্য আর অসিত করেনি।

আপনার শুনতে কেমন লাগছে তা জানি না। কারণ যে গল্প বলে, সে যদি বলবার মত করে বলতে পারে, তাহলে অত্যন্ত অসামাজিক কাহিনী বলে গেলেও নায়ক-নায়িকার প্রতি মমতা আসে। যেমন ধরুন সেই বিশ্ববিখ্যাত অশ্লীল না শ্লীল বইটি, লেডি চ্যাটার্লির কাহিনী। লরেন্স বলেছেন বলেই তো সহানুভূতি,

নাহলে পর্নোগ্রাফি নয় কি! বলুন না আপনি?

—আপনি এত সবিনয় নিবেদন হচ্ছেন কেন? আপনার প্রশংসা করব না, কারণ আপনাকে দেখলেই মনে হয় আপনি সারাজীবন একটা অদৃশ্য প্রশংসার থালা সামনে রেখে বসে আছেন। আর ক্রমশ তাতে মোহর টাকা সিকি আধুলি স্তূপীকৃত হচ্ছে। আপনি খুব চুপচাপ থাকেন জানি। তখনও আপনাকে যতটা আকর্ষণীয় লাগে, দেখছি মুখ খুললেও ততটা। আপনি এ গল্প বলতে চেয়েছেন আপনার বান্ধবী লাবণ্যর জন্য সামান্য সহানুভূতি কুড়োতে, তাই না? তা এ কথা জোর গলায় বলব, যে লাবণ্যকে আপনি এতক্ষণ ধরে তিল তিল করে গড়েছেন তাকে ভালো না বাসে এমন সাধ্য কার?

প্রথমা অভিভূতের মত মাথা নীচু করলেন। দ্বিতীয়ার দৃষ্টি অবিশ্বাস্য কঠিন হয়েছিল। প্রথমার নীচু মাথার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অতি কষ্টে তা নরম করে আনলেন।

—লাবণ্যর কথা বলতে বলতে আমার নিজের সম্বন্ধে কয়েকটা ব্যক্তিগত কথা না বলেই পারছিনে। কথাগুলো বলতাম না। আপনি কথা তুললেন বলেই মনে হল। আপনি যে মোহর, টাকা, আধুলির কথা বলেছেন তার খানিকটা ঠিক হলেও সবটা নয়। প্রশংসা আমিও পেয়েছি। কিন্তু ঘৃণায় পাথরও আমার সামনের থালা ভরে আছে। যাক্ আমার কথা থাক। লাবণ্যর কথা বলি।

লাবণ্য সাতদিন শমিতার সান্নিধ্যের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা আর অসিতের সান্নিধ্যের অবর্ণনীয় আনন্দ সহ্য করল।

দেখুন ব্যাপারগুলো কত জটিল। এ তো থিয়োরী নয়, বাস্তব জীবনে প্রযুক্ত। জীবনে প্রয়োগ করলে এ জটিলতা আরো দুরূহ হয়ে ওঠে, কারণ সেখানে দুরূহ করবার উপকরণ বড় বেশি। শমিতা মানেই সব সময় যন্ত্রণা না, এবং অসিত মানেই শুধু আনন্দ একথাও ভাববেন না।

লাবণ্যের জীবনে যদি একটা রংই থাকে, ভাববেন না তা শুধু কালো। তার অজস্র লোভ ছিল। অসংখ্য শেড্। সেই কালোর নানা শেড্ নিয়ে লাবণ্য তাসের অসংখ্য পারমুটেশন কম্বিনেশন করে দেখতো দুঃখের মধ্যে আবার কোথায় কম দুঃখ।

ধরুন, শমিতা—অসিত—লাবণ্য—, বা শমিতা—লাবণ্য—বৌদি, বা লাবণ্য—অজয়—অসিত, বা অসিত—লাবণ্য—বৌদি কিন্তু প্রায় এক সবই। তফাৎ

শুধু উনিশ-বিশ। শ্রাবণ মাসে রোজই আকাশের মুখ মেঘলা। একপোঁচ দুপোঁচের কম-বেশি। এক এক ত্রিকোণে এক এক রকম দুঃখ লাবণ্যের। সব সময় হারাই ভাব। একেক সময় ভাবে: শমিতা অত সুন্দর, ওর শরীর অত সুন্দর। আমার শরীর অত সুন্দর না। তাহলে অসিত আমাকে চাইবে কেন? অসিত আমাকে চায় না। হয়ত আমাকে চায় না। হয়ত আমাকে নিয়ে মজা করে। লোকে আদর করে অদ্ভুত—জীব পোষে না? ঠিক সেই রকম।

তাহলে? তা যদি হয় অসিত স্কুলে যাবার রাস্তায় রোদ জল বৃষ্টি সহ্য করে রোজ দাঁড়াত কেন? তাহলে ডায়মণ্ড হারবারে অসিত তার হাত ধরে বলল কেন, 'আমি শুধুই তোমার।' সেদিন বৃষ্টির রাতে আমার কোলে মুখ রেখে কেন বললে, 'আমি কাঁদতে এসেছি।'

লাবণ্য অদ্ভুত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছিল। অসিত তার দিকে একটু হেসে চাইলে মনে হত তাকে ভালোবাসে। শমিতার দিকে একবার হেসে চাইলে মনে হত শমিতাকে ভালোবাসে। অসিতের সঙ্গে যখন এমন এক বাড়িতে থাকা, যেখানে সারাদিনই দেখা, তখনই লাবণ্যর সব চেয়ে বেশি কষ্ট। প্রতিটি আচরণের জন্য কথা জমে ওঠে। এত মেশামেশিই কাল হল। কে যেন এক আত্মীয় এসে বললে, লাবণ্য আজ স্কুল যায়নি। শমিতা অসিতের অফিসে টেলিফোন করে শুনলে, অসিতও অফিসে যায় নি। লাবণ্য বাড়ি ফিরতেই চটে শমিতা বললে,—অসিতের সঙ্গে আলিপুরের দিকের কোনো বাগানে গিয়েছিলে? লাবণ্য মড়ার মত শাদা মুখে শমিতার দিকে তাকাল। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে তার সুটকেস নামিয়ে জামা-কাপড় গুছোতে আরম্ভ করল।

শমিতা তার ঘরে ঢুকল না। কিন্তু গলা খুব ছোট না করেই বৌদিকে সব কথা জানিয়ে দিতে দেরি করলে না। লাবণ্য এও শুনতে পেলে বৌদি তাঁর ভাই-এর ঘাড়ে ভর-করা পেত্নীটিকে সমানে গলা মিলিয়ে বাপান্ত করেছেন। সে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। না, আর কারো কাছে বিদায় নেবার নেই তার। কাউকে সাবধান করবার নেই। লাবণ্য ইচ্ছে থাকলে অসিতকে সাবধান করে যেতে পারত। করলে না। যা যন্ত্রণা তা যদি দুভাগ না হবে, তাহলে অসিতের ভালোবাসা সম্পূর্ণ হবে কি করে?

লাবণ্য তার বাবা-মায়ের কাছে চলে গেল। ব্যাপারটা নিয়ে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একটা ছিছিক্কার পড়ে গেল। সবাই জানল বিয়ের আগেও যেমন অসিতকে

আঁকড়ে নিয়েছিল লাবণ্য যতখানিটা পারে, বিয়ের পরেও তা করতে ছাড়েনি। বিয়ের আগের ব্যাপারটা তবু বোঝা যায়। একটা আশাকে লালন করা কোনো অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে নাগালের বাইরে হলেও অন্যায় নয়। কিন্তু বিয়ের পর সেই একই আশাকে দুধকলা দিলে তা যে সাপ হয় একথা লাবণ্যর মত মেয়ের বোঝা উচিত ছিল। এ করে কি হবে? ভিক্টোরিয়া আর আলিপুরের বাগানে একটুখানি দেখা হওয়ায় কি তৃপ্তি? মাঝ থেকে অসিতের সংসার ভেঙে দেয়া।

লাবণ্য কলকাতা সহ্য করতে পারলে না। এমন কি তার গলির মধ্যেকার বাপের বাড়িতে লুকিয়েও কোনো লাভ হল না। অসিতের বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন সেখানে গিয়েও হাজির। লাবণ্য নাকি তাঁদের ছেলেকে ভুলিয়ে দিয়েছে, ভেড়া করে দিয়েছে। লাবণ্য কলকাতা ছেড়ে এক গ্রামের স্কুলে পালাল।

সেখানে পর্যন্ত ধাওয়া করে গেল অসিত। চিঠির পর চিঠি।

লাবণ্য দু'হাত জোড় করে অসিতকে অনুরোধ জানিয়েছে,—অসিত, তুমি দয়া কর! আর এস না। আমাকে অন্তত চাকরি করে খেতে দেবে তো দু'বেলা দু'মুঠো তুমি?

মাথা নীচু করে অসিত ফিরে গেছে। তারপর লাবণ্য খবর পেয়েছে, অসিত বম্বেতে চাকরি নিয়ে চলে গেছে।

—আর শমিতা? অহেতুক ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন দ্বিতীয়া।

—শমিতা তখন সন্তানসম্ভবা ছিল। সে অসিতের সঙ্গে গেল না। বাপের বাড়ি চলে গেল। অসিত লাবণ্যর কাছ থেকে এসে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল সংসারের ভিতর ডুবে যাবার। শমিতাকে ডেকেছিল অসিত। বার বার চিঠি দিয়ে ডেকেছিল। শমিতা কিছুতেই অসিতের কাছে ফিরে গেল না। অসিত লাবণ্যকেও চিঠি লিখেছিল। লাবণ্য তার উত্তর দিয়েছিল। সে চিঠি অসিত বম্বে গিয়ে পায়। চিঠিতে লেখা ছিল—'অসিত, তোমার জন্য আমি চিরজীবন অপেক্ষা করে থাকব।'

দ্বিতীয়া নড়েচড়ে বসলেন। উলের বোনাটা হাতে তুলে নিলেন।

—আপনার গল্পটা তাহলে বিয়োগান্ত? অবশ্য লাবণ্যের যে চরিত্র তা কালো হীরে কেটে তৈরী। ও চরিত্র বিয়োগান্ত না হলেই মানায় না।

—না, জানেন আমার গল্প বিয়োগান্ত নয়। এই অসাধারণ সমে এসে যদি গল্প শেষ করে দিতে পারতাম খুব সাহিত্যোচিত হত। কিন্তু জানেন জীবন তারপরেও যে থাকে।

লাবণ্য যখন বারাসতে তার আশাহীন ভরসাহীন স্কুল-জীবন কাটিয়ে যাচ্ছিল, কোথা দিয়ে দিন রাত সময়, তার নিজের একলার সময় যাচ্ছে জানা নেই, শুধু স্কুলে মেশিনের মত কর্তব্যদান আর বাড়িতে টাকা পাঠানো এছাড়া জীবনে কিছু নেই, তখন অসিতের হাতেও সেই একই আকারহীন সময়। নিদারুণ একলা সময়। সে পুরুষমানুষ, তার চাকরি আছে, দায়িত্ব আছে, টেলিগ্রাম মারফৎ সে এ খবরও পেয়ে গেল যে তার একটি মেয়ে হয়েছে, সে এখন একজন বাবা। তখন শমিতা একটা বিস্ময়কর কাজ করলে। এক মাসের মেয়েকে দিদিমার কাছে রেখে সে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হল আর লিগাল সেপারেশনের একটা নোটিশ দিলে অসিতকে।

অসিতের আত্মীয়-স্বজন তাকে অনেক বোঝালো। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটার implication কতখানি প্রগাঢ়। উত্তর কলকাতার এক বনেদী অসূর্যম্পশ্যা পরিবারের মেয়ে হয়ে শমিতার প্রথম অপরাধ পালিয়ে বিয়ে করা, তারপরে অপরাধের পর অপরাধ। যতদিন অসিতের সঙ্গে ছিল ততদিন প্রগল্‌ভ, ভীষণভাবে উচ্চারিত চিৎকৃত ঝগড়া, সন্দেহ, অপমান। সর্বশেষে আবার হঠাৎ উকিলের চিঠি।

শমিতার পাঠানো উকিলের চিঠি পেয়ে অসিত হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তার পৌরুষেও লেগেছিল। সে শমিতাকে চিঠিতে অনুরোধ করলে মেয়ে নিয়ে তার কাছে চলে আসবার জন্য। সব ভুল-বোঝাবুঝি ছেড়ে। শমিতা সে চিঠির কোনো উত্তর দেয়নি। সে কি বলতে চেয়েছিল তা কেউ জানে না। তিন বছর বাদে শমিতা যখন আইন সঙ্গত ডিভোর্স করলে তখন সে এম. এ. বি. টি পাশ করেছে। মেয়ে নিয়ে মফঃস্বলের একটা স্কুলে শমিতা হেড্‌ মিসট্রেস হয়ে চলে গেল।

প্রথমাকে বাধা দিয়ে, চমকে দিয়ে, প্রায় দৈববাণীর মত হঠাৎ বলতে আরম্ভ করলেন দ্বিতীয়া,—আশা করি শেষটা আমাকে বলতে দেবেন। আমি খুব সুন্দর করে, খুব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বলব কিন্তু। ধরুন তারপর একদিন লাবণ্য ক্লান্তির পর স্কুল থেকে ফিরছে, পা আর চলছে না—সন্ধ্যার সময় কালিমা-মাখা কোয়ার্টার্সে তার আর ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না। বারান্দায় ইজিচেয়ারে খানিকক্ষণ বসে রইল লাবণ্য। আরো শীর্ণ হয়ে গেছে সে। কালোপাড় ফরাসডাঙা শাড়ির আঁচল মাটিতে একটু লুটোচ্ছে, ঘুম পাচ্ছিল লাবণ্যর। মন ভালো নেই। অসিতের চিন্তাই তার একমাত্র চিন্তা। সেই সতের বছর

থেকেই সেই একই চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে লাবণ্যকে। শমিতার সঙ্গে অসিতের ডিভোর্সের কথা লাবণ্যর কাছে যথাসময়েই শুভার্থীদের চিঠি মারফত পৌছেছে। সে-সময়টা লাবণ্যর চিঠিতেই সেই মফঃস্বল শহরের পোস্ট্ অফিস ভরা।

দু'একটা চিঠির ভাষা শুনবেন?

"নাও এতদিনে তোমার পথের কাঁটা সরল। এবার বিয়ে করো অসিতকে, মুণ্ডু তো চিবিয়ে খেয়েছ, এবার ধড়টাকে চিবোও।"

লাবণ্য চুপ করে বসেছিল। সন্ধ্যা জমাট হয়ে আসছে। অন্ধকার—গাছ-পালার পুঞ্জে দু'একটি জোনাকি। চারিদিক চুপচাপ, খালি ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। সাইকেল-ঘণ্টার আওয়াজ। লাবণ্য চমকে উঠল। অসিত না? অসিত আর তার ছোট্ট একটা স্যুটকেস। হাসছেন যে? ঠিক বলছি না? বলুন না, লজ্জা কি বলুন!

প্রথমার অনাবিল হাসির দিকে তাকিয়ে থামলেন দ্বিতীয়া, এবং তিনি থামতেই আরম্ভ করলেন প্রথমা,—আপনি ভীষণ চালাক। সত্যি এত বুদ্ধিমতী আপনি, এমনি দেখলে তো বোঝা যায় না। আপনার বুদ্ধি আর সহৃদয়তার জন্য একটা উপহার এখনিই দিতে পারি আমি। যাক্ গে, নায়িকা ছদ্মবেশ ত্যাগ করল, কাহিনীর বাকিটায় আমি লাবণ্যকে আর রাখব না। সোজাসুজি বলি, হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন প্রায় তাই।

সেদিন দুপুরের দিকে অসিতের চিঠি এসেছিল। আমার চাকর যথারীতি আমার রাইটিং টেবিলে রেখে দিয়েছে। কিন্তু মন এত খারাপ ছিল ফিরে এসে আর রাইটিং টেবিলের দিকই মাড়াইনি। একটু চুপ করে বসেছিলাম।

সত্যিই আমার পরনে ওই কালোপাড়টার ধরনেই একটা শাড়ি ছিল। অসিত সেই সময়টাতেই এলো। তার সঙ্গে স্যুটকেসও ছিল না। সে রাজপুত্রের মত এসেছিল অদম্য ইচ্ছা আর বাসনার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে।

আমাকে সে উড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল।—চলো রুবি এখুনি চলো। সব পড়ে থাক। আবার সব নতুন করে হবে। সব ছেড়ে এসো। আমি নতুন চাকরি নিয়ে এসেছি। বন কেটে নতুন বসত বসছে। সেখানকার লোহার চুল্লীতে চাকরি, চলো আজ রাতেই চলে যাই।

আমি অনেক কিছু ফেলে গিয়েছিলাম। সেদিনই যাইনি। বিশেষ করে তার দেওয়া প্রতিটি জিনিস গুছিয়ে পরদিন সকালে আমি তার সঙ্গে চলে গেলাম। সেই নতুন শহরে আমাদের বিয়ে হল। ছেলে হল। পনের বছর

কেটে গেল।

—তারপর কলকাতায় এলেন তাই না ?

—হ্যাঁ। বড় আশা ছিল, ভেবেছিলাম এতদিনে সবাই ভুলে যাবে। যে দোষে আমি দোষী নই সে দোষের জন্য ক্ষমা পাব। কিন্তু জানেন, কেউ ভোলেনি। একজনও না।

অনেকক্ষণ চুপ।

শীতের ধোঁয়াটে অপরাহ্ণ এ বাড়ির বারান্দায় মহিলার মুখের সমস্ত জ্যোতি হরণ করে গেছে। অন্ধ ছায়ার মত চাকরটি এসে তলানি-জমা কফি লাগানো একটু ময়লা কফির বাসনগুলো নিয়ে গেল। আচারের জারগুলি নিঃশব্দে তুলছে এবার। ঘরে ঘরে নিয়মমত আলো জেলে দিলে কেউ। হাসপাতালের দালানে জমা আলোর মত লাগলো। সারা দুপুর ধরে যে জ্বরটা আসি আসি করছিল, হঠাৎ এই ক্লিষ্ট শীতের সন্ধ্যায় সেই জ্বর আচ্ছন্ন করে রইল মহিলা দুজনকে।

দ্বিতীয়া যখন নিঃশব্দে উঠি উঠি করছেন, প্রথমজন ক্লান্ত গলায় বললেন, —কিছু পেলাম না, জানেন। টাকাপয়সা সব পেয়েছি, আমার চারপাশেই তার অজস্র প্রমাণ আছে। কিন্তু আজও কোথাও কারো কাছে যেতে পারি না। আমার কোন আত্মীয় নেই, স্বজন না। বাবার সঙ্গে ঠিক ততদিন একটা টাকাপয়সা 'লেন' বলব না, 'দেনে'র সম্বন্ধ ছিল, এখন ভাইবোনেরা মানুষ হয়েছে, জানি না তারা কি শুনেছে, কেউ আমাকে চায় না। জানি না কেন আমাকে সবাই ঘৃণা করে। আমাকে দেখলেই চুপ করে যায়।

দ্বিতীয়া সেলাই-এর প্যাকেটটা তুলে নিলেন।—সত্যি ব্যাপারটা বড় দুঃখের। আপনিই বলেছিলেন না, এতদিন পর মানুষের মধ্যে শত্রুতার ধারও ভোঁতা হয়ে যায়। সহানুভূতির শেষ পারানির কড়িও না থাকা সত্যিই বিয়োগান্ত।

—আচ্ছা এবার চলি। আমার উনি হয়ত এতক্ষণ এসেই গেছেন।

প্রথমা আর উঠলেন না। তিনি সেই একভাবে অন্ধকারে ইজিচেয়ারে বসে রইলেন। দ্বিতীয়ার মূর্তি যখন ছোট হয়ে সিঁড়িতে বাঁক নিয়ে মিলিয়ে গেল, তখনো তিনি সেই অদ্ভুত সব পেয়ে সব না পাওয়ার যেন একটা ইলেকট্রিক চেয়ারে একলা হিমে স্থির বসে।

প্রতিনায়িকা

তিনি নিজের বাড়ি থেকে বেরোলেন। বহুদিন পরে জানলা দেয়াল শার্সি দরজা গ্রীলের বাইরে এলেন। তাঁর শরীরে হঠাৎ হাওয়ার ঝলক লাগলো।

ঠাণ্ডা শৈত্য মেশানো হলেও, হাওয়া উড়ে আসছে রেল লাইনের ওপার থেকে। হাওয়ার সঙ্গে আসছে শুকনো পাতা, শীতের গাঢ় গন্ধ। তিনি কারো সঙ্গে বিশেষ সখ্য করেন না। অথচ সম্প্রতি তাঁর ভিতরে একটা চাপা বোধ যেন পাথর ঠেলে বেরোতে চাইছিল।

আজও ঠিক সেদিনের মতই ঝিমন্ত দুপুর। প্রথমা অনেকদিন পরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমেছেন, রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন। কতদিন পর তিনি খোলা আকাশের তলায়, হাওয়ায় বাতাসে শীতের গন্ধ নিলেন। হাল্কা পোড়া পাতার গন্ধ। পীচের রাস্তার গা থেকে লাল খোয়া ওঠা সরু রাস্তাটা পাড়ার মধ্যে ঘরোয়া হয়ে ঢুকে গেছে। সংযোগস্থলেই একটা ঘোড়ানিমগাছ। ছাদে দাঁড়িয়ে তিনি দেখছিলেন আজ সকালে কুয়াশার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসে কটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ডালপালা আর শুকনো পাতা পোড়াচ্ছিল। তিনি ঝুঁকে দেখছিলেন আবছা ভোরের আলোয় করমচা রঙের আগুনের লিকলিকে জিভ। কখনো বা আগুনের ভিতর খুঁচিয়ে তোলা আগুনের ফুলকি।

ঠাণ্ডায় ছাদের ঠাকুরঘরের সামনে এসে তিনি কেন যে দাঁড়িয়েছিলেন আজ সকালে তা তিনি নিজেও জানেন না। সেই দুপুরের পর থেকে তাঁর ভিতরে অজস্র নতুন নতুন ভাবনা চিন্তা উপলব্ধি চক্র কেটে কেটে ঘুরছে। তিনি দ্বিতীয়ার সঙ্গে কেন যেন আরো কিছু কথা বলতে চান।

আজ ভোরে ছাদ থেকে পাতা পোড়ার গন্ধে করমচা আগুনের মাথাথেকে ওপরে উঠতে থাকা নীল ধোঁয়ার শিখায় আস্তে আস্তে বাধার দরজাগুলো যেন আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছিল। বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে আরো বড় রাস্তায় না গিয়ে তাই তিনি বাঁক নিলেন ঘরোয়া লালমাটির রাস্তায়।

খানিকদূর এগিয়ে গেলেই সেই 'আনন্দ-নিকেতন'। না, বাড়িটার নাম নেই কোনো। কিন্তু 'আনন্দ-নিকেতন' কি কেবল নাম দিলেই হয়। আনন্দধারা

সর্ব অঙ্গ দিয়ে ঝরে ঝরে পড়লে তবেই না সার্থকতা।

সেকেলে ধাঁচের নীচু কাঠের গেট্। হাল্কা সবুজ রঙ করা। গেটটি খুললে ক্যাঁচকোঁচ্ শব্দ হয়। তিনি যখন ঢুকলেন তাঁর গালের পাশে লাগলো লতানে গোলাপের একগুচ্ছ পাতার হাল্কা একটি আঁচড়। ভিতরে ঢুকে প্রথমেই তাঁর চোখ পড়ল সরু তেকোণা ইটের পাড় দেওয়া মোরামের রাস্তার পাশে গাঁদা গাছের তলায় ছোট্ট ফুটফুটে একটি শিশুর ওপর। কত আর বয়স হবে, বড় জোর চার-পাঁচ। মাথা নীচু করে একমনে রান্নাবাটি খেলছিল। পরনে লাল টুকটুকে পশমের ফ্রক্। পায়ে একজোড়া ময়লা কেড্স। ওঁর ছায়াটি তার রদ্দুর আড়াল করতেই বড় বড় দুটি চোখ তুলে তাকালো সে। কপালে পড়া গুচ্ছ গুচ্ছ চুলের ফাঁক দিয়ে তাকাতে সত্যিই খুব ঝামেলা হচ্ছিল তার। তা ছাড়া নাকের ডগায় লেগেছিল একবিন্দু লাল ধুলো। প্রথমা নীচু হয়ে নিজের কাচ-স্বচ্ছ ফিকে বাদামী টাঙ্গাইলের আঁচলে তার মুখটি মুছিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, তখনই দ্বিতীয়া সামনের দরজার সবুজ পর্দাটি সরিয়ে বেরিয়ে এলেন।—মুন্নি এসো, একটু দুধ-বিস্কুট,···আরে আপনি ?

—এলাম !

সুখী শরীরে ঘরোয়া করে পরা শাড়িটি সামলাতে সামলাতে দ্বিতীয়া অভ্যর্থনার উজ্জ্বল হাসিতে বিকীর্ণ হলেন। আন্তরিক কণ্ঠে বললেন, আসুন আসুন, কী ভালোই যে লাগছে—আপনি এসেছেন !

প্রথমা বললেন,—ভারি ঘরোয়া আপনার বাগানটি।

—আমরা দুজনেই গাছের ভক্ত। যেখানে যখনই যাবেন সেখানকার গাছ নিয়ে আসা চাই-ই। ওই যে গেটে দেখুন না পাহাড়ি গোলাপলতা। কার্সিয়ঙে ওরা বলে বুনোগোলাপ। তাই-ই এনে লাগিয়েছেন। ও তো ফুল দেয় না, কিন্তু সারে আর যত্নে পাতা দেয় অনেক। চলুন রদ্দুরে আর দাঁড়াবেন না, ঘরে চলুন

—কেন, রদ্দুর তো বেশ মিষ্টি লাগছে। এখানে আপনাদের রকে বসলেই তো হয়।

দ্বিতীয়া সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, কখ্খোনো না ! এখানে বসলে আপনি তাড়াতাড়ি পালাবেন। না, রোদ পড়লে বিকেলের আলোয় আপনাকে বাগান দেখাবো। এখন ঘরে চলুন। আমার ঘরেও খুব সুন্দর রোদ আসে।

প্রথমা হাসলেন,—চলুন !

ইতিমধ্যে মুন্নিও ছুটে এসে তার দিদিমার হাত ধরেছে।

অবাক হয়ে চাইছে প্রথমার দিকে।

—এই বুঝি আপনার নাতনী!

—হ্যাঁ, মেয়ের মেয়ে। মুন্নি!

—এরই জন্যে বুঝি সেই পশমের জামাটি বুনছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আর তো গেলেন না আমার ওখানে! জামাটা শেষ করবেন না?

—জামাটা শেষ হয়ে গেছে।

—নিজেই করে ফেললেন?

—না, আমার সেই বান্ধবীটি কলকাতায় এসেছে। ওর সঙ্গে দেখা হ'ল। ভারি ভালো বুনতে পারে। ও-ই জামাটা শেষ করে দিল।

সবুজ পর্দা সরিয়ে ওঁরা একটি প্যাসেজে গিয়ে পৌছোলেন। চকমেলানো সারি সারি ঘরের মাঝখানে উদার চৌকোণা উঠোন। ভিতরেও চওড়া রক। ঝকঝকে সিমেণ্ট মার্জনায় পরিচ্ছন্ন। শাদা পাটভাঙা পর্দা সরিয়ে দ্বিতীয়া বললেন, —আসুন এই ঘরে।

প্রথমার চোখ দুটি এই শান্ত পরিবেশে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। তিনি বললেন, ভারী সুন্দর সাজানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ি আর বাগান আপনার।

—না না, সাজানো বাগান বরং আপনার। আমার বাগানটা তো জঙ্গল!

কিন্তু ঘরের মধ্যে না ঢুকে চারপাশ দেখতে দেখতে যেন বিতর্কে জেতার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন প্রথমা। তিনি যেন প্রমাণ করবেনই দ্বিতীয়ার সব ভালো।

—আপনার বাড়িটা আমার বারান্দা থেকে একরকম দেখায়, খোকার জানালা দিয়ে আর এক রকম। আবার আমাদেরই বাড়ির ছাদ থেকে দেখলে আপনাদের বাগানটাকে যেন চেনাই যায় না। সত্যি হিংসে করার মত সুন্দর, ঘরোয়া আপনার বাড়িটা। সকলেরই স্বপ্নের মধ্যে বোধ হয় এমনি একটা বাড়ি থাকে।

—না না, তা কেন? সকলের স্বপ্ন তো এক হয় না। তা যদি হতো, আমাদের এই কলোনীতে সবাই এমনি লাল টালি আর সবুজ জানলা দেওয়া বাড়ি বানাতো।

—বড়লোকির কথা তুলবেন তো? ওসব থাক না! কালই তো ছাদে গিয়েছিলাম। আমার টি. ভি'র এরিয়ালটা ঠিক করতে। দেখলাম আপনার

বাড়ির মাঝখানের এই চৌকো উঠোনটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। উঠোনের মাঝখানের ওই ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ গাছটা কি এই জমিতে আগেই ছিল ?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। এ জমিটা ছিল এক বড় মানুষের এক বিশাল বাগানের অংশ। পেছনদিকের বাগানে একসার পামগাছ আছে। তার দুটো অবশ্য বাজ পড়ে মরে গেছে। আর কয়েকটা অদ্ভুত চেহারার কমন ক্যাক্‌টাস্‌। আমার বাগানের সঙ্গে ওই গাছগুলোকে ঠিক মেলানো যায় না। তবু মায়া করে ওগুলোকে উপ্‌ড়ে দিতেও পারিনি।

—কাল দেখছিলাম, ইউক্যালিপ্‌টাসের তলায় বাঁধানো বেদীতে বসে বসে আপনি কার যেন পিঠে তেল মালিশ করছিলেন। লজ্জা পাচ্ছেন! অবশ্য প্রতিবেশীর পক্ষে নিষিদ্ধ দৃশ্যই বলা যায়।

—ও হ্যাঁ, কাল যে রবিবার ছিল।

—আজ বোধ হয় আপনার বাড়ি খালি।

—হ্যাঁ, আজ বাড়িতে কেউ-ই নেই বলতে গেলে।

—দেখলাম আপনার কর্তা অফিস গেলেন। আপনার মেয়ে-জামাই আর ছেলে দুটিও বেড়াতে বেরুল। সঙ্গে দেখলাম অনেক মালপত্র।

—হ্যাঁ, চায়ের ফ্লাস্ক্‌, পিকনিক্‌-বক্স, টিফিন-কেরিয়ার। মেয়ে এতদিন পরে কলকাতায় এসেছে, তাই ওদের সবাইকে যোগাড়যন্ত্র করে পিকনিকে পাঠালাম।

—তা নাতনীকে পাঠালেন না?

—কত বললাম মুন্নিকে, ও একটা বোকারাম। দিদাকে ছেড়ে ও কোথাও যাবে না। আসুন এবার ভিতরে, আমার ঘরে চলুন।

প্রথমা ঈষৎ হাসলেন। তাঁর টানা-টানা গভীর চোখ দুটিতে দু'ফোঁটা বিষণ্ণতা দুলছে। বললেন, আজ কিন্তু সারা দুপুর আপনাকে জ্বালাব,—বিকেলের আগে ছাড়ছি নাকি আপনাকে ?

বসবার ঘর শোবার ঘর সব সারি সারি। পিছনে উঠোনের একধারে টিউব-ওয়েল, আর তার পাশে ছায়াঘন খিরকীর পাঁচিল।

পর্দা সরিয়ে দ্বিতীয়া বললেন, এই আমার ঘর। আসুন।

দরাজ ঘর। বড় তক্তপোষে শাদা ধবধবে বিছানা। দ্বিতীয়া প্রথমাকে টাল-করা বালিশে হেলান দিয়ে বসতে বললেন। বিছানার ওপর জানলা দিয়ে রোদের ঝলক এসে পড়েছে। লেপগুলো গরম হচ্ছে উঠোনে। রোদে। দ্বিতীয়া

গরম চাদর দিয়ে সযত্নে প্রথমার পা দুটি ঢেকে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি বসুন, আমি মুন্নিকে দুধমুড়ি দিয়ে ভিতরে রকে বসাই। অবশ্য ও বেশিক্ষণ ভিতরের রকে বসবার মানুষ নয়। ঠিক বাইরে বাগানে বেরিয়ে যাবেই। তা যাক গে, এই জানলা দিয়ে গেট্ পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। আমরা এখান থেকেই ওকে দেখতে পাবো।

দরজার দিকে এগোতে এগোতে ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে দ্বিতীয়া বললেন, সারা দুপুর জমিয়ে গল্প করা যাবে, আমিও আপনাকে কফি খাওয়াতে পারব। এই যে দেখুন না, আমার মেয়ে বিয়েতে দুটো ইলেকট্রিক কেট্লি পেয়েছিল। একটি সে আমাকে দান করে গেছে। কেট্লিটা আসা ইস্তক বাড়ির কর্তা পর্যন্ত আজকাল সময়ে অসময়ে 'কফি' 'কফি' করে বিরক্ত করেন।

একটু হেসে পর্দা সরিয়ে মুন্নির হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন দ্বিতীয়া।

প্রথমা আরামে নরম বালিশের থাকে হেলান দিয়ে ভাবছিলেন, এই ছোট্ট বাংলো ধাঁচের বাড়িটায় একটা আলাদা উত্তাপ আছে। কোথাও যেন সেনট্রাল হিটিঙ-এর সামিল একটা মনোরম উষ্ণতা। হয়তো সেই ওম্ হৃদয়ের। হৃদয় যখন সারা শরীরে ঠিকমত রক্ত পাঠায় আর ফেরায়, যখন কোথাও, কোনো রকম কলঙ্কবিন্দু থাকে না, সবটা রক্তই স্বাস্থ্যকর সঞ্জীবনী রসে প্রাণার্পিত হয়, তখনই এমনি ওম্ বিকীরিত হয় এ বাড়ির ঘরে, দালানে এবং উঠোনে। এবং বাগানেও উছলে পড়ে গাঢ় সবুজ। ফুল তোলার সঙ্গে সেই সতেজ উষ্ণতাকে তুলে নেওয়া যায়।

ঘরটি বড়।

না, তাঁর বিশাল, জম্কালো বেডরুমের মত নয়। এ ঘরে দুজনের শোবার পক্ষে বেশ বড় ঢালা বিছানা। দুটি বড় বড় তক্তপোষ জোড়া করা। পুরু তোষক পাতা। গদী নেই। হয়তো ছেলেমেয়েরা যখন ছোট ছিল বাবা-মার সঙ্গে একবিছানায় শুতো। ঘরের বাঁদিকের দেয়ালে কাপড়জামা রাখার আলমারি। ছোট্ট একটি স্টীলের আলমারি, বই-এর তাক, ছোট টেবল, টেবলে বইপত্র, একটি টেবিল-আলো। সেকেলে কলাইকরা শেড্ দেওয়া। আর একটি টেবল ছোট সাবমিটারের স্যুইচের নাগালের মধ্যে। সেখানেই ছোট হিটার, ইলেকট্রিক্ কেট্লি, কফির সরঞ্জাম, কয়েকটি শিশি ও টিনে বিস্কিট্ প্রভৃতি সাজানো।

আলনায় কর্তার পাঞ্জাবি-পাজামা সব গুছোনো। মহিলার খানকতক

শুকনো শাড়ি আর শেমিজও তার সঙ্গে মিলেমিশে আছে। দেয়ালে দুটি ছবি। একটি ওঁদের বিয়ের পরে তোলা সেই স্বামী-স্ত্রী ছবি। দেখলেই বোঝা যায় দ্বিতীয়া এককালে রূপসী ছিলেন। আর ছিপ্ছিপে রোগা। আর একটি ছবি দরজার পাশে। আলোপাখার স্যুইচ্বোর্ডের ওপরে। একটু ঝুল জড়ানো। কাচে পুরু ময়লা। তাই ঝাপ্সা দেখা যায়। পুরোনো ফ্রেমে বাঁধা একটু বাঁকাভাবে ঝোলানো। ছোট্ট ছবি। স্কুলের টিউনিক্ পরা, দুটি অল্পবয়সী বালিকা।

দ্বিতীয়া ফিরে এলেন।

—আপনাকে অনেকক্ষণ একলা রেখেছি, না? সব ঝামেলা মিটিয়ে এলাম। এবার নিশ্চিন্তে আড্ডা দেওয়া যাবে। কি দেখছেন? ওঃ ছবি! ওটা আমারই ছোটবেলার ছবি। আমার যে বান্ধবীর কথা আপনাকে বলছিলাম না, আমার সেই ছোটবেলার বান্ধবী, তার আর আমার।

—কোন্ বান্ধবী বলুন তো?

—বাঃ মনে নেই, আমার যে বান্ধবীর কথা সেদিন গল্প করতে করতে মাঝে মাঝেই বলছিলাম আপনাকে। ব্যবহারিক জীবনের কয়েকটা চাল মেয়েটা ঠিক সময় শিখতে পারেনি বলে একেবারে ভেসে গেল। দাঁড়াতে পারল না বন্যাকে রুখে দিয়ে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছিলেন বটে!

—আজকে যদি তার গল্প আপনাকে বলি, শুনবেন? বলুন তাহলে শোনাতে পারি। আপনার সেদিনের গল্পের ধার আজকে শোধ করে দিতে পারি।

—নিশ্চয়ই। গল্প দিয়ে গল্পের ধার শোধের চেয়ে আর ভালো কিছু নেই!

—শুনবেন তাহলে? সত্যি?

—বাঃ, নিশ্চয়ই! গল্পের জন্যই তো এই ভরদুপুরে আপনার উপর ভর করেছি?

প্রথমা আশ্চর্য শাদা দাঁতে নির্মল হাসলেন। দ্বিতীয়া প্রথমার পাশে পা গুটিয়ে বসলেন। কি যেন ভেবে নিলেন খানিক, তারপর বললেন, আপনার গল্পের করবী দত্তের কাহিনী সত্যি। সে একটি সত্যিকার চরিত্র। তাই আপনি নিজেকে দু ভাগ করে বন্ধু তৈরী করে নিয়েছেন। কিন্তু আমার গল্পে বন্ধুর ভূমিকাটি সত্য। আমি যদিও আপনারই আদলে বন্ধুর জবানীতেই

গল্পটা বলে যাবো, তবু জানবেন শমিতার কাহিনী আমার জীবনকাহিনী নয়। আমার বান্ধবীর জীবনকাহিনী। এবং আমি তার একটি সত্য ও প্রকৃত বন্ধু ছিলাম। আর একটা কথা। আমি খুব একটা ভালোমত বলিয়ে-কইয়ে নই। হয়ত আপনার মত অত ভালো করে গল্পটা বলতে পারব না। কিন্তু তবু দয়া করে আমার গল্পটা শেষ না হলে আপনি যাবেন না।

প্রথমা হাসলেন. দ্বিতীয়ার কথায়। সামনে রাখা একটা ডিশে ভাজামশলা ছিল। বেছে বেছে কয়েকটা লঙ্গ মুখে দিলেন।—না না, আপনার ভাবনা নেই। আমি সবটা শুনতেই তো এসেছি।

দ্বিতীয়া বললেন, দেখুন আপনার গল্পের ওই শমিতা নামটি আমার খুব পছন্দ হয়ে গেছে। আপনার কাছ থেকে নামটা শোনবার পর আমি কেন যেন নামটাকেই ভালোবেসে ফেলেছি। আমি যদি আমার বন্ধুকে শমিতা বলে ডাকি, তাহলে আপনি কি কিছু মনে করবেন ?

—না, না, কিছু মনে করব না। আমি যার নাম শমিতা দিয়েছিলাম, তার আসল নামটা তো শমিতা নয়। তার আসল নামটাই আমার মনের ভিতর বিঁধে আছে। থাকবেও চিরকাল। কাজেই তার নকল নামটা নিয়ে আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন। আমার কোনো আপত্তি নেই।

—দেখুন আমার গল্পেও কিন্তু 'লাবণ্য' থাকবে। আপনাকে আগেই বলেছিলাম।

—থাকুক না, আপত্তি নেই। গৌর-চন্দ্রিকা রেখে এবার আপনার গল্প বলুন !

দ্বিতীয়া এবার জমিয়ে বসে বললেন,—দেখুন শমিতার কাহিনীর সঙ্গে লাবণ্যের কাহিনীর অনেক তফাৎ আছে। লাবণ্যের গল্প আপনি খুব সবিনয়ে আরম্ভ করেছিলেন। বড় নীচু পর্দায়। প্রায় সেই হান্‌স ক্রিশ্চিয়ান এ্যাণ্ডারসনের 'আগ্‌লি ডাকলিঙ্‌' গল্পটির ছাঁচে। অনেকগুলি পাতিহাঁসের ছানার মধ্যে একটি সবচেয়ে কুৎসিত ছানা, সকলের তাচ্ছিল্য সয়ে সয়ে ঘুরে বেড়াত। একদিন সেই বহুলাঞ্ছিত হাঁসেরছানাটিই একটা অপূর্ব সুন্দর রাজহাঁস হয়ে গেল। আপনার গল্পও প্রায় তাই। কালো, দরিদ্র একটি করুণ মেয়ের গল্প। আপনি সেদিন গল্প করতে করতে বলেছিলেন যে, লাবণ্যের জীবনের পাতাগুলো যে আর একবার উল্টেপাল্টে দেখা হচ্ছে তাতেই সে সম্মানিত। আমার মনে হয়, লাবণ্য বোধ হয় অতটা হেলাফেলার

বস্তু নয়। শমিতা কিন্তু······থাক গে যা বলছিলাম···শমিতা বুধের দশায় জন্মেছিল। রূপোর এবং রূপের দুটো চামচাই ছিল তার মুখে। শমিতা ছিল কলকাতার বনেদী পরিবারের মেয়ে। তার মা ছিলেন রাজকন্যে। অর্থাৎ তার মায়ের বাবার টাইটেল ছিল 'রাজা'। রাজকন্যের বিয়েও হয়েছিল যোগ্য ঘরে। যোগ্য বরে। শমিতার বাবাও ছিলেন খুব নামকরা মানুষ। অত্যন্ত ধনী লোক। শমিতার ছোটবেলার গল্প শুনতে শুনতে আমার যেন প্রায়ই স্নো-হোয়াইটের গল্প মনে পড়ে যেত। সেই যে, জানলার ধারে বসে রাণী সেলাই করছিলেন। বাইরে তুষারপাত হচ্ছিল। রাজা বললেন, 'বল তো রাণী আমাদের ছেলে হবে ? না মেয়ে ?' রাণী চম্‌কে উঠলেন। তাঁর আঙুলে ফুটে গেল সোনার ছুঁচ। তবু অত যন্ত্রণাতেই তিনি হাসলেন। বললেন, 'আমাদের ছোট্ট একটি মেয়ে হবে।' এককোঁটা রক্ত পড়েছিল জানালার বাইরের জমে ওঠা শাদা বরফে। রাণী স্বপ্নাবিষ্টের মত বলেছিলেন, আমাদের মেয়ের গায়ের রঙ্‌ হবে বরফের মত শাদা, তার গাল দুটি হবে গোলাপের মত গোলাপী আর ঠোঁট দুটি রক্তের মত লাল। আর তার মাথার চুল ? চুল হবে আমার সেলাই-এর এই কালো রেশমের সুতোর মত, কুচ্‌কুচে কালো। শমিতাও ওর মায়ের তেমনি একটি স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। তার জন্মের আগে থাকতেই তার রাজেন্দ্রাণী মা যে কত পোষাক, কত আসবাবপত্র সাজসজ্জা স্তূপাকার করে ফেলেছিলেন তার ঠিক নেই। কিন্তু স্নো-হোয়াইটের দুঃখিনী জননীর মতই শমিতার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার মায়ের মৃত্যু হ'ল। ছোট্ট মেয়েটাকে তার মার গর্ভ থেকে টেনে বের করার সময়েই তার মায়ের দেহ ক্রমশ ঠাণ্ডা আর শক্ত হতে আরম্ভ করেছিল। এখনো তাঁর সেই সুন্দর ছবিটি আমার চোখে ভাসছে। শমিতার শোবার ঘরে তার মায়ের সেই বিরাট অয়েল-পেনটিংটা। এত সুন্দরী মহিলা আমি জীবনে কখনো দেখিনি আর। অবশ্য তাঁকে তো রক্ত-মাংসের চেহারায় দেখবার সৌভাগ্য হয়নি আমার। কেবল তাঁর ছবিই দেখতে হয়েছে।

আর শমিতার বাবা! বিশাল জমিদারী ছিল তাঁর। ছিল নানান ব্যবসা। সন্ধ্যেবেলা থেকেই তাঁর বাগানবাড়ী যাওয়ার জন্যে তোড়জোড় শুরু হত। ওখানে বাইজী আর মদের ঢালাও ব্যবস্থা। আবার সকালবেলায় পুজো-আচ্চাও ছিল। দুপুরে কাছারিতে বসা। ব্যবসাপত্তরের খোঁজ নেওয়া। সেকালের কলকাতার তীব্র রজোগুণী মানুষ যেমন হতেন শমিতার বাবাও যেন

প্রায় তেমনি ছিলেন।

ভারী চেহারা। টকটকে রং। পাকানো গোঁফ। মাঝে সিঁথি-কাটা কোঁকড়ানো চুল। অট্টহাসিতে দেওয়াল কাঁপিয়ে দেওয়া মানুষ। প্রতিদিন লোকজন অতিথি অভ্যাগত ছাড়াও একশো পোষ্য আত্মীয়ের পাত পড়ত তাদের বাড়ি। শমিতার বাবা ছিলেন অসম্ভব স্নেহ-প্রবণ পিতা। যতদিন দিদিমা তীর্থে ছিলেন ততদিন শমিতার বাবা মাতৃহীন শমিতাকে বুকে করে আগলে রেখেছিলেন। কোনো কাজ করতেন না। কোথাও যেতেন না। কেবল মেয়ের কাছে থাকতেন। তার খাওয়া ঘুম সব দিকে লক্ষ্য রাখতেন।

শমিতার দিদিমা শমিতার মায়ের মৃত্যুর খবর জানতেন না। অকালে কন্যা প্রসব করার কথাও জানতেন না। তিনি নিশ্চিন্ত তীর্থ করে সবতীর্থের মঙ্গল নির্মাল্য নিয়ে ফিরে এসে শুনলেন, নাতনী হয়েছে তাঁর। আর মেয়েটি মারা গেছে। দিদিমা ফিরে আসার পর শমিতার বাবা নিশ্চিন্ত হলেন। শমিতাকে পাঠিয়ে দিলেন দিদিমার কাছে।

সে বাড়িও তো রাজবাড়ি। দিদিমা আর মামারা। শমিতার মামারবাড়ি ছিল শোভাবাজারে, আর আমরা থাকতাম বিডন স্ট্রীটে। আমরা দুজন নার্সারি থেকে একই মিশনারী স্কুলে পড়তাম।

ছোটবেলার স্মৃতির কথা যখন মনে পড়ে তখন সবচেয়ে আগে মনে আসে শমিতাদের সেই মস্ত নীল রঙের রোলসরয়েস গাড়িটার কথা। গাড়ির হর্ন থেকে আরম্ভ করে মার্ডগার্ড পর্যন্ত লম্বা এক হাঁ-করা রূপোর সাপ ছিল। বিরাট পাইথন। সেই সাপটার মুখ দিয়ে হর্নের গম্ভীর আওয়াজ বেরোত।

শমিতাদের গাড়িটা যখন আমাদের স্কুলের রাস্তায় ঢুকতো তখন আমরা রীতিমত ভয় পেয়ে যেতাম প্রথম প্রথম। কিন্তু শমিতাকে দেখলে শুধু ভালোবাসতেই ইচ্ছে যেত। ওর আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। ফুলের মত নরম আর তাজা চেহারা ছিল শমিতার। থোকা থোকা বাদামী রিঙের মত চুল। সামান্য নেভি-ব্লু স্কুল-টিউনিকেই তাকে দেখাতো বিলিতি ছবির বইতে আঁকা রাজকুমারীদের ছবির মত। শমিতার সঙ্গে সেই ছোট্টবেলা থেকেই আমার ভাব।

মনে আছে প্রথম যেদিন শমিতা ওর শোভাবাজারের সেই মামারবাড়িতে নিয়ে যায় আমাকে, আমি কি বিষম হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন ছিল শমিতার দিদিমার কি একটা ব্রত উদ্‌যাপন। সারাদিন ছিলাম শমিতাদের

ওখানে। শমিতা বার বার করে আমার মা-বাবার অনুমতি চেয়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।

আমার মনে আছে, শমিতাদের সেই বিরাট নীল রোলসরয়েসটা যখন ওদের সেই নহবৎখানা সমেত বিশাল গেট্-টা পেরিয়ে ঢুকলো, ফোয়ারা পাথরের মূর্তি নকল পাহাড় চিড়িয়াখানা,—হ্যাঁ আক্ষরিক অর্থেই চিড়িয়াখানা, পাখি, পাখি, কেবলই পাখি—পেরিয়ে মোটা মোটা গথিক থামওয়ালা বারান্দার তলায় এসে দাঁড়াল তখন মনে হল আমি যেন এই মাটির পৃথিবী, এই কলকাতা শহরকে রূপকথার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি।

সামনের উঁচু উঁচু থামগুলোর মাথা খুঁজতে গিয়ে ঘাড় ভেঙে আকাশের সমান্তরাল হতে হল। এই ধরনের বাড়ি কলকাতায় আর বেশি অবশিষ্ট নেই। পুরোনো সেনেটের ধাঁচে তৈরী বাড়ি। উঁচু বালিপাথরের ফ্লোর। কুড়িটা সিঁড়ি পেরিয়ে তবেই বালি পাথরের ফ্লোর। একটি বিশাল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একটি ফ্রক্ পরা মেয়ে যে সেদিন কি অকিঞ্চিৎকর হয়ে গিয়েছিল আপনাকে তা বলতে পারব না।

শমিতার হাত ধরে ধরে সেদিন তাদের বাড়ির কোণায় কোণায় ঘুরলাম। যা দেখেছিলাম তার সব বলতে গেলে বেলা যাবে। প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে ইতিহাস আর কিম্বদন্তী জড়ানো। প্রতিটি মানুষ বিচিত্র। নাচঘর, টানাপাখা, দুর্গাপূজার মণ্ডপ, গৃহদেবতার মন্দির, ভাঙা অব্যবহৃত অন্দরমহল, পোড়ো আস্তাবল, তোষাখানা, শমিতার বৃদ্ধা দিদিমা,—সব মিলিয়ে যেন সতের থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘুরে আসা। কিন্তু সেদিনের কথা অন্যদিন বলব। আজকের ঘটনা অন্য।

প্রথমা বললেন, সেই অন্য ঘটনার কথাই বলুন না!

দ্বিতীয়া বললেন, ঘটনাটা কিছুই নয়, নেহাতই শমিতার মনের এক ধরনের একটা ভঙ্গী। কিন্তু ছোট ছোট ছবি দিয়েই তো মানুষকে বোঝা যায়। অত বড় বাড়ি, অত আসবাবপত্র, ঠাটঠমক, তবু শমিতা আমায় কি বলত জানেন,—'আমার কিন্তু এই বিরাট বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে রান্নাশালের পিছনের ওই শিউলিতলাটা। রোজ ভোরে যখন ঘুম ভেঙে যায়, আকাশে টলটল করে নীলচে শুকতারাটা, আমি তখন এখানে চলে আসি। কেউ ওঠে না তখন। এখানে এসে একা একা শিউলি কুড়োই। ঘাসের মধ্যে বসে থাকি। অনেক দুব্বো হয় ওখানে। তুই দুব্বো ঘাস চিনিস? ওই ঘাসে

ঠাকুরপুজো হয়। দিদা আমাকে বেলপাতা ছিঁড়তে শিখিয়েছে। তিনটে করে বেলপাতা কাটতে হয় কি ভাবে!'

আমি ওকে প্রশ্ন করতাম, 'তুই বিকেলবেলাটা কি করিস?'

—"বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে আবার এই শিউলি তলায় চলে আসি! শিউলি গাছের পাশে, ওই পাম গাছের তলায় পিপঁড়ের বাসা হয়েছে একটা। আমি চুপ চাপ বসে থাকি। ওদের চলাফেরা দেখতে দেখতে বিকেল কেটে যায়। জানিস পিপঁড়েদের গর্তে নামতে কষ্ট হচ্ছিল দেখে, আমি একটা ছোট্ট দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে সিঁড়ি বানিয়ে দিয়েছিলাম। ওরা কি সুন্দর সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নামছিল।"

এই হচ্ছে শমিতা!

—বুঝলাম্। কিন্তু একটু যেন ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছেনা আপনার শমিতার গল্প?

দ্বিতীয়া মাথা হেলিয়ে হাসলেন। পরণের শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে নামলেন তক্তপোষ থেকে। কফির কেটলিতে জলভরে স্যুইচ টিপে দিলেন। দুটি মোটাসোটা, ধব ধবে শাদা চীনে মাটির পীরিচ পেয়ালা সাজালেন সামনে। চিনির শিশি আর কনডেনসড্ মিল্কের টিন নামালেন। তারপর প্রথমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—পৃথিবীকে দু ধরণের মনো ভাব দিয়ে চেনা যায়। অভিজ্ঞতা, আর উপলব্ধি! এ কথাটা আপনি মানেন?

প্রথমা হেসে বললেন, বুঝতে পারলাম না আপনার কথাটা। আর একবার বলুন।

—বলছি, উদাহরণ দিয়েই বলছি যেমন ধরুণ আপনার কাহিনীর লাবণ্য। সে হোস্টেলে থাকত। সে গরীব ছিল। তাই কারো সঙ্গে পারতপক্ষে মিশত না। আপনার লাবণ্যকে কখনো বলে দিতে হয়নি, কোথায় কি ভাবে বলতে হয়। কার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় কিংবা মিশতে হয়। কিন্তু আমার বন্ধু শমিতা যদি ওই হোস্টেলে থাকত তাহলে সে কি করত বলুন তো?

প্রমথা বললেন,—আপনার জল কিন্তু ফুটছে। সাঁই সাঁই শব্দ হচ্চে। এবার স্যুইচ্ বন্ধ করুন।

দ্বিতীয়া স্যুইচ্ বন্ধ করে কফি বানাতে বানাতে বললেন, হোস্টেলে গিয়ে শমিতা কখনই চুপচাপ করুণ নেত্রে এককোণে বসে থাকত না। নিজের দারিদ্র্য নিয়ে, সঙ্কুচিত হয়ে একা একা দূরে দূরে ঘুরে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করত না।

সে সমানে সমানে মিশতে যেত। পদে পদে অপমানিত হ'ত। তারপর আপনি সেদিন মেয়েদের হোস্টেলে ওই বয়সের মেয়েরা কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে তার যে বর্ণনা দিয়েছেন সেই মেয়েদের হাতে মার খেয়েও বোধহয় তার চৈতন্য ফিরে আসত না। জীবনে পদে পদে বার বার শমিতা কাদায় বালিতে ধুলোয় ঘষা খেয়ে, অপমান সয়ে সয়ে তারপর এতদিনে বুঝতে শিখেছে সত্যিই তার কি করা উচিত ছিল। কিসে তার জিত! কিন্তু এখন বড় দেরি হয়ে গেছে। এত জেনেও কোনো লাভ নেই।

বিছানার মাঝখানে ছোট্ট একটি জলচৌকি পেতে তার ওপর কফি আর বিস্কিট সাজিয়ে দিয়ে দ্বিতীয়া প্রথমার মুখোমুখি বসলেন।

—আমরা কি করি? যাদের ভালো লাগে না তাদের সঙ্গেও মোলায়েম লোকদেখানি ভালো ব্যবহার করি। পরে ওই ব্যবহারের ছুতোয় অনেক সুবিধাও নিই। শমিতা কিন্তু একেবারেই সে রকম ছিল না। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি কাউকে অপছন্দ করলে তার চোখেমুখে তার অসন্তোষ ধরা পড়ত। সে সোজাসুজি ঝগড়া করে বসত। মনোমালিন্যও হ'ত। সে যত প্রতাপশালীই হোক না কেন, শমিতা ভবিষ্যতের কথা ভেবে, আখেরের কথা ভেবে, কখনো তার সঙ্গে পোষাকী ভদ্র ব্যবহার করতে পারত না।

আর তাতে ক্ষতি হ'ত তার নিজেরই, আর কারো নয়। প্রথমা অনেকক্ষণ বাদে বেশ নড়েচড়ে বসলেন। কফির ধূমায়িত কাপটি তুলে নিয়ে আরামে চুমুক দিতে দিতে বললেন,—আপনার বান্ধবী, তার মানে, সংসার-অনভিজ্ঞ ছিল, তাই না? অবশ্য এই জীবনটা আমাদের ঠিক আগুনের মত। অনভিজ্ঞতার দোষ সে ক্ষমা করে না। আগুনের শিখায় হাত ছোঁয়ালেই তো হাত পুড়বে। ভুল করলেই শাস্তি। কিন্তু আপনার বান্ধবীর এডলেসেন্স পিরিয়ড কি জীবনব্যাপী?

—যদি বলি জীবনের কতকগুলো ক্ষেত্রে সত্যিই শমিতা তার 'শৈশব' পেরোয়নি কোনোদিন, তাহলে ভুল বলা হবে না। তেমনি অন্য কতকগুলো ব্যাপারে তার মন ছিল আশ্চর্য পরিণত। মাঝে মাঝে আমরা তার কথায় তার ভাষায়, তার দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্বে অবাক হয়ে গেছি। আর সে ছিল অসম্ভব সেনসিটিভ্। রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে শুনতে তাকে কাঁদতে দেখেছি। বৃষ্টিতে কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত ভিজতেও দেখেছি।

শমিতা যখন চোদ্দ বছরে পড়ল তখন ওর খুব অসুখ হয়েছিল। অসুখ

সারার পর চেঞ্জে গেল শমিতা। পুরীতে। পুরী থেকে আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখত। মাস তিনেক পুরীতে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে এল শমিতা। আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বিশ্বাস করুন মাত্র তিন মাসে শমিতা একেবারে বদলে গিয়েছিল। আমূল পালটানো যাকে বলে। আমি শমিতাকে সেই পুরোনো শমিতা বলে একেবারেই চিনতে পারিনি।

তিন মাসে শমিতা হঠাৎ যৌবন-ছুঁই-ছুঁই হয়ে গিয়েছিল। ভারী মিষ্টি লাগছিল ওকে। ও ফ্রকই পরত। কিন্তু সেদিন ওকে দেখলাম হাল্কা বাসন্তী রঙের তাঁতের শাড়িতে। কালোপাড়ের চওড়া বর্ডার পায়ের পাতা ছুঁয়ে আছে। গায়ের রঙ ঈষৎ বাদামী হয়েছে রোদে আর লোনাজলে। চুলে চোখে ঠোঁটে দেহে সজল কোমল একটা শ্রী লেগেছে।

আমরা দুজনে ফিরে এলাম আমাদের বাড়ি। ছাদে উঠে নিরিবিলিতে দাঁড়াতেই শমিতা আমাকে অসিতের কথা বলল।

প্রথমা সশব্দে কফির কাপটা নামিয়ে রাখলেন। তাঁর টানা টানা অন্তর্ভেদী চোখ দুটি তুলে তাকালেন দ্বিতীয়ার দিকে। আপনি চম্‌কে উঠলেন যে?—হ্যাঁ, ছেলেটির নাম অসিতই দিচ্ছি! থাক্ না ওই নামটাই। আমার আপাততঃ আর কোনো নামই মনে পড়ছে না।

শমিতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অসিতের একটা পরিচয়ও পেয়ে গেলাম। অসিত শমিতার দূর-সম্পর্কের লতাপাতায় কি রকম যেন এক আত্মীয় হয়। চেঞ্জে গিয়ে আবার সেই পুরোনো আলাপটা ঝালাই হয়েছে। শমিতার চেয়ে মাত্রই কয়েক বছরের বড়। দারুণ ভদ্র, দারুণ সুন্দর, বড্ড ভালো, আরো কত কি? শমিতার ঝুলিতে যত বিশেষণ ছিল সব ঝেড়েঝুড়ে বের করে যেন অসিতের নামের পাশে লাগিয়ে দিচ্ছিল শমিতা।

ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হল না। পুরীতে শমিতারা যে বাড়ী নিয়েছিল, তার খুব কাছাকাছিই বাড়ি নিয়েছিল অসিতরা। কেবল অসিতদের পরিবারই নয়, অন্য একটি পরিচিত পরিবারও গিয়েছিল পুরীতে। শমিতা যে বড় হয়েছে, সুন্দর হয়েছে, বাঞ্ছনীয় হয়েছে একথা যেন চারিদিকে রটে গিয়েছিল। ওই পরিবারেও ছিল সুমন্ত আর তরুণ। আরো দুটি উজ্জ্বল যুবক। কিন্তু শমিতা পুরীর সেই হৈ-হৈ হুড়োহুড়ি, সেই হলি-ডে মুডের পরিবেশে এতজন গুণমুগ্ধ যুবকের দৃষ্টির পূজোয় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। সে একমাত্র অসিতকেই ভালোবেসেছিল। কি সামান্য পরিচয়ে অসিতকে যেন সে সব কিছু দেবার

জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল।

তাদের ভালোবাসার পশ্চাদপটে ছিল প্রকৃতি। সমুদ্র। আর কি চাই বলুন। অসাধারণ সমুদ্র যেন পিতার মত, পুরোহিতের মত, বন্ধুর মত তাদের অল্প বয়সের নির্মল পরিচ্ছন্ন তুটি মনকে যেন এক করে মিলিয়ে দিচ্ছিলেন। ভালোবাসার টানা-পোড়েনের সুতোর সঙ্গে ওই সমুদ্র, সূর্যাস্ত, সৈকত, ঝিনুক সব যেন একসঙ্গে কারু কাছের মত বোনা হয়ে গিয়েছিল।

শমিতা আজও সে সব দিনের কথা ভুলতে পারে নি। সুমন্ত তরুণ আর অসিত, তিনজনই দারুণ ভালো ছেলে। সম্ভাবনাময় পাত্র বলতে পারেন। তিনজনেরই শমিতাকে ভালো লেগেছিল। কিন্তু শমিতার ভালো লেগেছিল অসিতকে।

কারণ অসিতের মনটি ছিল ভারী পবিত্র। কোথাও কোনো দাগ লাগেনি। কোনো মালিন্য নয়। শমিতার সঙ্গে তার বয়সের খানিকটা তফাৎ ছিল। অরুণ আর সুমন্তের মধ্যে যে চপলতা, যে মাত্রাছাড়া উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব ছিল তা অসিতের মধ্যে একদমই ছিল না। অসিত চুপচাপ বসে থাকতে ভালোবাসত। কিম্বা একা একা সমুদ্রের তীর ধরে বহুদূর হেঁটে যেত। এমন কি ছুটি কাটাতে এসেও সে পড়াশুনো ছাড়েনি। কিছু কিছু পড়াশুনোও করত। ক্রমশ ক্রমশ সুমন্ত আর অরুণের সঙ্গ ছেড়ে শমিতা অসিতের সঙ্গেই বেশি মিশতে আরম্ভ করল।

পুরীতে বাড়ির আড়ষ্ট আব্‌হাওয়া নেই। দিদিমা নেই। বাবার শাসন নেই। শমিতা মনের আনন্দে অসিতের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াত। ওর বাবাও বিশেষ বাধা দিতেন না। তুজনের মধ্যে একটা দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তার অজুহাত ছিল। তুজনে বালিয়াড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াত। ভিজেবালির ওপর ঘর বানিয়ে তার পাশে নিজেদের নাম লিখে দিত।

এ ছাড়া ছিল সমুদ্রস্নান। সে এক উল্লাস। বাবা মেয়ে—সুমন্ত, অরুণ, অসিত। শমিতা শাড়ি পরেই স্নান করতে নামত। কিন্তু ঢেউ-এর ধাক্কায় শাড়ি গায়ে থাকে নাকি! ভিতরে থাকত টকটকে লাল সুইমিঙ্‌ কস্টিয়ুম, খাস বিলেত থেকে আনানো। তার সেই অপরূপ শরীরের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যেত না। সমুদ্রের নীল পশ্চাদপটে শমিতার সেই লাল কস্টিয়ুম পরা শুভ্র চেহারাটির কথা একবার মনে করুন।

দ্বিতীয়া কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন।

প্রথমা বললেন, মনে করতে পারি, ভারী রঙীন, ভারী উজ্জ্বল ছবি। একেবারে চৌরঙ্গির রেলিঙে সাজানো শস্তা রঙীন ক্যালেণ্ডার-সুন্দরীদের মত দেহসর্বস্ব!

কফির কাপ দুটি নীচে নামিয়ে রেখে দ্বিতীয়া বললেন,—আমার মনে হয় ঠিক তার উল্টো। নাহলে ওদের ভালোবাসা খুব সহজেই দেহ ধরে নেমে আসত শরীরী-সম্বন্ধে! কিন্তু প্রথম দিকে তা' ত হয়নি। শমিতার রূপের দেহাতীত দিকটা অসিতকে এত মুগ্ধ রেখেছিল যে তার দৃষ্টি আর দেহ বেয়ে নীচে নামেনি। একদিন সমুদ্রস্নানের সময়েই শমিতা অসিতের সঙ্গে বহুদূর চলে গিয়েছিল। পরে অসিত শমিতাকে বলেছিল, সেইদিনই সে বুঝতে পেরেছিল শমিতা ছাড়া তার আর গতি নেই।

শমিতা অবশ্য অনেক আগেই বুঝেছিল সব। এখন দুজনের ইচ্ছে এক হয়ে মিশল।

হঠাৎ দুপুরে লুডো খেলতে খেলতে শমিতার দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠা, কিংবা অসিতকে একা থাকতে দেখলে হঠাৎ এসে তার চুল এলোমেলো করে দেওয়া—এই সব মিলিয়ে ক্রমশ দুজনের শরীর মন জুড়ে, জড়িয়ে একটা সুস্থ জান্তব ভালোবাসা আস্তে আস্তে চেহারা নিতে লাগল।

—ওই তো, শরীরটা শেষ পর্যন্ত এসেই গেল। বাদ দিতে পারলেন না তো?

হাল্কা রঙের শাড়ির মধ্যে ভঙ্গী বদলে বসলেন প্রথমা। তাঁর মুখে তীব্র একটি হাসি।

—আমি তো একবারও বলিনি, ওদের ভালোবাসা শরীরকে বাদ দিয়ে একেবারে প্লেটনিক্! আমাদের এই স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনে দেহাতীত ভালোবাসা-টাসা কোথায়? তবে অল্প বয়সের দেহাকাঙ্ক্ষা যেমন স্বাভাবিক যেমন সহজ, বেশি বয়সের দেহাকাঙ্ক্ষা তেমন নয়! দুটি অল্পবয়সী মানুষ পরস্পরকে পরস্পরের প্রথম ভালোবাসাই দিয়েছিল। তার সঙ্গে কোনো সমস্যা জড়িয়ে দিতে চায়নি।

পুরীর সেই দিনগুলো ওদের কাছে কেমন ছিল জানেন—প্রথমা তিক্ত হেসে বললেন, ঠিক যেন হিন্দি সিনেমার ড্রিম সিনের মত!

—ব্যাপারটাকে এত ঠুন্‌কো ভাবছেন কেন আপনি?

—ভাবব না! এ যেন পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী!

—আপনার কথাটা অবশ্য পুরোপুরি অস্বীকারও করা যায় না। তবে একথা মিথ্যে নয়, যে, অসিত আর শমিতা খুব বোকার মত ভেবেছিল তাদের এই হাওয়া-বদলের দিনগুলি বুঝি আর ফুরোবে না। বাস্তব পৃথিবীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে তারা সমুদ্র আর আকাশের তলায় অনন্তকাল ধরে পরস্পরকে ভালোবাসতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত ফেরার দিন এসে গেল। অসিত এসেছিল তার এক দূর-সম্পর্কের দাদার পরিবারের সঙ্গে। একসঙ্গে একই দিনে দু-পরিবারের ফেরার ঠিক হ'ল।

যখন বাঁধাছাঁদা চলছে ওরা দুজন শেষবারের মত গিয়ে বসল সমুদ্রের তীরে। তখন গোধূলি।

শমিতা বলেছিল, আহা এমন সুন্দর রঙীন বিকেল আমরা আর কাল থেকে দেখতে পাবো না। আবার কলকাতা!

—কেন? আমাদের বিয়ের পর আবার আসব তোমাকে নিয়ে!

শমিতা লজ্জা পেয়ে মাথা নামিয়ে বালির ওপর নিজের নাম লিখছিল।

অসিত ছেলেমানুষের মত বলেছিল, সত্যি! চাকরি পেলেই তোমায় বিয়ে করব। তোমাকে ছাড়া কি করে থাকবো বলো না? ভাবা যায় নাকি?

—তুমি তো আই. এসসি পড়ছো! এখন কিই-বা চাকরি পাবে? ততদিনে একা একা থাকতে থাকতে আমি মরেই যাবো হয়ত!

—যাঃ, ও কথা বলে না!

অসিত ভিজেবালির ওপর রাখা শমিতার নরম করতলটি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল।

আমি শমিতার কাছ থেকে সব কিছুই শুনলাম। এরপর আমাদের দুজনের দেখা হলেই শমিতা কেবল অসিতের কথাই বলত। মাঝে মাঝে আমায় বলত শমিতা, তোর ওই এক কথা শুনতে শুনতে খুব বোর লাগে না রে? কিন্তু কি করব বল্, তোকে ছাড়া আর তো কাউকে মনের কথা খুলে বলতে পারি না।

কলকাতায় ফিরে আসার পর পুরীর অন্তরঙ্গতার সূত্র ধরে অসিত কিছুদিন শমিতার মামার বাড়ি গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে কেবল বাবা নেই, আছেন জবরদস্ত্ দিদিমা। নানারকম আত্মীয়-স্বজন। রাজবাড়ির প্রসিদ্ধ পর্দা প্রথা। অসিত এলে দেউড়ি থেকে তিনতলার খাসমহল পর্যন্ত সাড়া পড়ে যেত। দিদিমার অনুমতি নিয়ে দোতলার বসবার হলঘরে নামতে পেত শমিতা। আশেপাশে থাকত সমবয়সী পোষ্য সখীরা, দাসী চাকর!

ইঁট কাঠ আর পাঁচিলের দেয়াল তোলা কলকাতা, পুরোনো বাড়ির গলা-চাপা আবহাওয়ায় আস্তে আস্তে ভালোবাসার স্বাভাবিক মুক্ত গতিটি যেন ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে যেতে লাগল। আর আসল দূতের ভূমিকা যার ছিল, সেই প্রবল প্রতাপান্বিত সমুদ্র, সেই-ই তো অনুপস্থিত কলকাতার ওই রুক্ষ গলিতে।

ক্রমাগত তিনমাসে ওই মুক্ত জীবনের পর ওই বাঁধন ওই নিষেধের বেড়া আর কি শমিতার সয়? আর আপনাকে তো আগেই বলেছি, শমিতা একটু বেশি রকম ভাবপ্রবণ ছিল। ওর সবই বেশি বেশি। ওর আবেগ দুঃখ সুখ আনন্দ সবই ছিল সাধারণের তুলনায় অনেক বেশি।

শমিতা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকত অসিতের জন্যে। সারাদিন যেন আর কোন কাজ নেই। সারাদিন কেবল অসিতের কথা—অসিতের ভাবনা। অসিতের স্মৃতিতে গুন্‌গুন্‌, চিঠিতে গুনগুন। এ ছাড়া শমিতার আর কোনো অস্তিত্বই নেই। ফাঁকে ফাঁকে সজল, ছলছলে জীবন। কবিতার বই নিয়ে বসল হয়ত, -দেখে সঞ্চয়িতার পাতায় পাতায় ওরই মনের কথা কবিতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত বারান্দায় দাঁড়াল। শহরের বাড়ির সারির মাথায় মেঘের সজ্জা। অমনি তার অসিতের কথা মনে পড়ল।

—অসিত, তুমি এখন কি করছ? তুমিও কী মেঘ দেখছ? শমিতার অনুরোধে অসিতকে বিকেলে আসতেই হ'ত। বাড়ির সবাই অসন্তুষ্ট হ'ত। তাতে কী?

আর সারাদিন মড়ার মত কাটিয়ে অসিত এলেই যেন বেঁচে উঠত শমিতা। নড়েচড়ে বেড়াত। যতক্ষণ অসিত থাকত, ততক্ষণ যেন ষোল আনার ওপর আঠারো আনা হয়ে বেঁচে উঠত শমিতা। আর অসিত চলে গেলেই ধুঁউস করে নিভে যেত।

আমি বহুদিন শমিতাকে এইভাবে বেঁচে থাকতে দেখেছি। বড় কষ্টের এই বাঁচা। কখন বিকেল? কখন অসিত? শমিতাকে আমি সেই বিকেলের জন্যে দিনের পর দিন ছট্‌ফট করতে দেখেছি।

অথচ অসিত যেই এলো, অমনি শমিতার মুখ গম্ভীর। ওর দেখাদেখি অসিতের মুখও গম্ভীর। অসিত যদি পাঁচ মিনিটও দেরি করে আসত, শমিতা পাগল হয়ে যেত। ওই পাঁচ মিনিটের ক্ষতিও সে সহ্য করতে রাজি নয়। তাই কখনো রাগ করে উঠে চলে যেত, কখনো কথাই বলত না। অসিত প্রথমে করুণ নয়নে সাধ্যসাধনা করত, পরে রাগ করে চলে যেত। অসিত যখন নীচে নেমে

যেত, তখন বারান্দায় দাঁড়াত শমিতা। নীচের দীর্ঘ আলোকিত পথ দিয়ে খেলার মাঠ, চিড়িয়াখানা, ফোয়ারার সারি, কৃত্রিম পাহাড়, বাগান সব পেরিয়ে অসিত হেঁটে যেত, নিরুপায় শমিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত। তারপর ঘরে ফিরে এসে নিজের পড়ার টেবিলে বসত শমিতা। তারপর নিজের ডায়েরীর পাতায় তার মনের সব কথা উজাড় করে দিত। তারপর লিখতে শুরু করত দীর্ঘ দীর্ঘ চিঠি। কখনো দিন দুটো, কখনো তিনটে। কখন সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত, রাত গড়িয়ে মাঝরাত। লেখাপড়া মাথায় উঠল। প্রি-টেস্টে শমিতার মত ব্রিলিয়াণ্ট মেয়ে, টেস্টে এ্যালাউ-ই হল না।

অসিতের অবস্থাও প্রায় তাই। ও ওর ইঞ্জিনিয়ারিঙ্-এর হেভী কোর্স-এর পড়াশুনোয় মাথা না ঘামিয়ে কেবল শমিতার চিঠির উত্তরে সমান পাগলামির চিঠি লিখে যেতে লাগল। সে সব চিঠি আমিও কিছু কিছু দেখেছি। আপনি যেমন বলছিলেন, আপনার গল্পের শমিতার চিঠিতে তার দুর্দমনীয় মনের বেগ টানা টানা লেখায় হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ঈ 'রেফে' ফুটে ফুটে উঠতো,—ঠিক তেমনি, অসিতের যে কটা চিঠি আমি দেখেছি, তাতেও অমনি প্রচণ্ড বেগ দেখেছি। তাতে ভাব নেই, ভাষা নেই, ব্যাকরণ নেই। কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দ যেন নিজেকে ভীষণ ভাবে ঘোষণা করছে! পাগলের মত ঘোষণা।

প্রথমা একটু চকিত হলেন, ইমোশনাল চিঠি অসিত লিখত? কে জানে? হয়তো একজনের ইমোসন আর একজনকে প্রভাবান্বিত করত!

দ্বিতীয়া একবার জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন। প্রথমাও দেখলেন,—মুন্নি আপনমনে খেলছে। আবার গল্পের সূত্র তুলে নিয়ে দ্বিতীয় বললেন, এইভাবে দিন গড়িয়ে মাস। মাস পেরুতে না পেরুতেই চেঞ্জের গাঢ় রঙ্ শমিতার শরীর থেকে উঠে গেল। কলকাতার কলের জলে, বদ্ধ ঘরের রৌদ্রহীন অন্ধকারে তার রঙ আবার স্বর্ণচাঁপার ভিতরের পাপড়ির মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠতে লাগল আর চোখের কোলে গাঢ় হয়ে পড়তে লাগল দুশ্চিন্তার কালি। নাওয়া-খাওয়া প্রায় নেই বললেই হয়।

অসিত একদিন আসেনি, শমিতা রাগ করে ব্লেড্ দিয়ে হাত কেটে রেখেছে। অসিত রাগ করে কথা বলেনি, শমিতা খাওয়া বন্ধ করেছে। অসিত শমিতাকে কি সব বকাবকি করেছে—শমিতা অমনি শীতের সন্ধ্যেবেলা ঠাণ্ডাজলে নেয়ে উঠল, তারপর তার ধুম জ্বর! কে কি বলবে বলুন? শমিতা অভিমানে, রাগে নিজে পুড়তো, অসিতকেও পোড়াতো?

প্রথমা বললেন, যাক্, তাহলে আমার গল্পের শমিতার সঙ্গে আপনার গল্পের শমিতার এতক্ষণে কিছুটা মিল পাওয়া গেল। তার মানে সব শমিতারাই সব অসিতকে জ্বালায় !

দ্বিতীয়া হাসলেন। তাঁর ফরসা গালে নরম টোল পড়ল। চওড়া সিঁদুর-টানা সিঁথির পাশের কাঁচাপাকা চুল একটু এলোমেলো হয়ে গেছে তাঁর। পরণের চওড়াপাড় ফরাসডাঙা শাড়িটা গুছিয়ে তিনি নিলেন, আমার গল্পে অসিতও শমিতাকে জ্বালাত-পোড়াতো। তার অনেক প্রমাণ আছে। শুনবেন ?

প্রথমা, বললেন, শোনালেই শুনবো !

—অসিত একদিন অন্যদিনের চেয়ে একটু সকাল সকাল এল। শমিতা বড় বারান্দায় থামের আড়ালে ঠায় তিনটে থেকে দাঁড়িয়ে। থামের আড়ালে বলে শমিতাকে অসিত দেখতে পাচ্ছিল না। তাই রাগে জ্বলছিল সে।

প্রথমা বললেন, আপনি না বললেন অসিত ভীষণ ভদ্র শান্ত পালিশ করা ছেলে !

—ছিলো তো তাই ! কিন্তু জানেন মানুষ কি রকম যেন বদলে যায় ! আমার সঙ্গে শমিতা অসিতের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ও নীচু স্বরে কথা বলত। ওর ভাষা ছিল ভারী মার্জিত। পরিশীলিত। সকলের বিষয়ে, সব বিষয়ে অসিতের অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখেছি, একমাত্র শমিতার বিষয়ে বাদ দিয়ে। সত্যি শমিতার সঙ্গে তার আচার-আচরণ ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। আমি নিজেই দেখেছি একবার রেগে গিয়ে অসিত শমিতার পায়ের পাতা জুতো দিয়ে থেঁতলে দিয়েছে। নখের দাগ বসিয়ে দিয়েছে শরীরে।

প্রথমা চম্‌কে তাকালেন, যাঃ, আমার বিশ্বাস হয় না !

—আমারও হ'ত না। কিন্তু আমি শমিতার ডান হাতের চামড়ায় পরিষ্কার পোড়া দাগ দেখেছিলাম। সেটা অসিতেরই কীর্তি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, যেদিন তারা শেষ দেখা করেছিল, ওই বাড়িতে শেষ—সেদিনের কথাই বলছিলাম আপনাকে। বারান্দায় অসিত শমিতাকে না দেখে এত রেগে গিয়েছিল যে শমিতা যখন চা নিয়ে এলো, তখন অসিত তাকে দূরের একটা কোণে ডেকে নিয়ে গেল। টানা লম্বা বারান্দা। প্রায় সারাবাড়ি ঘিরে আছে। একটা পামগাছের পাতার ঝালরের কাছে দাঁড়িয়ে অসিত একটা সিগারেট ধরালো। সে কখনো এ বাড়িতে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেত না। শমিতা দু-একটা

কথা বলার পরই, কোনো উত্তর না দিয়ে হঠাৎ জলন্ত সিগারেটটা শমিতার ডান হাতের ওপর চেপে ধরল। শমিতা সেই অসহ্য পোড়ার যন্ত্রণা একা সয়েছে, একটি কথাও বলেনি। ওই অসিতই আবার শমিতার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। এবং—

—অসিত ! শমি !

চমকে উঠে ফিরে তাকিয়েছিল শমিতা আর অসিত। মাসিরা, দিদিরা সবাই দাঁড়িয়ে।

ব্যস্, সব শেষ হল। অসিতেরও বিকেলবেলা এক ঘণ্টা আসাটাও গলা-চাপা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই আসাটুকুও বন্ধ হয়ে গেল।

নিজের কষ্ট তো ছিলই। উপরি বাড়ল আত্মীয়-স্বজনদের রাজনীতি। নাক-ঢোকানো পলিটিকস্। সেই পলিটিকসের প্রবল দাপটে ওরা যে ঝড়ের মুখে কুটোর মত উড়ে যাবে, এ কথা জেনে শমিতাদের মাসি-দিদিরা খুব নিশ্চিন্ত ছিল। ওর দিদিমাও মহাভাবনায় পড়েছিলেন। তিনি শমিতার বিয়ের জন্য অনেক বড় বড় রাজারাজড়ার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। তার তুলনায় ওই সামান্য অসিত ? আর পাঁচটা বাঙালী ধনীর তুলনায় অসিতরা বিত্তবান হলেও, শমিতার দিদিমায়ের অবস্থা তাঁর বংশগরিমার তুলনায় অসিতরা নেহাতই ফেলনা ছিল।

যাই হোক অসিত-শমিতার খবরটা আত্মীয়স্বজন মারফৎ অসিতদের বাড়িও পৌঁছে গেল। ওর বাবা মা দিদি সবাই জানলেন। দু'পরিবারই অনেক আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। তাই সমানে কথা চালাচালি হতে লাগলো। ছোট্ট জিনিসটা বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। যা ছিল এক নিমেষের আলিঙ্গন, তাই-ই ফুলে ফেঁপে হয়ে উঠল চুম্বন এবং ইত্যাদি ও ইত্যাদি !

কিন্তু জানেন, ওদের এই ভালোবাসায় কোথায় যেন একটা কঠোর 'সত্যি' ছিল। সেটাকে যতই কলঙ্ক-মলিনতা মাখিয়ে দেওয়া হ'ত, ততই কেমন যেন ঝলমল করে উঠত। ওরা ছেলেমানুষ ছিল। ওদের ভালোবাসার ভঙ্গিতেও ছেলেমানুষি ছিল সত্যি, কিন্তু সেজন্য ওরা কষ্টও কম সহ্য করেনি।

পাছে কোনো ছুতোয় অসিতের সঙ্গে দেখা করে শমিতা, তাই ওকেও বিরাট তিনতলা সাতমহলা বাড়ির ওপরের ঘরে নজরবন্দী করে রাখা হ'ল। যাকে বলে সেই রূপকথার কাহিনীতে পড়া মিনারবন্দী রাজকুমারী। এমন কি আমাদের মত ছোটবেলার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাতের কড়াকড়ি

হলো। শমিতার দিদিমা অবশ্য আমায় ডেকে একদিন খুব মিষ্টি মিষ্টি করে অনেক কথা বোঝালেন। শমিতা এসব ঘটনার পর সাতদিন জেদ ধরে কিছু খায়নি। তার প্রতিবাদ ছিল তার পড়াশোনা বন্ধ করার ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাবা আর দিদিমা রাজী 'হলেন। পরীক্ষা দিয়ে এলো শমিতা। পাসও করে গেল। বলাই বাহুল্য, চিঠিপত্র বিনিময়ের ভার আমরা দু-একজনও নিয়েছিলাম।

কিন্তু দেখা কি করে করানো যায়? আমরা নিজেরাই সব রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। আমাদের অত স্বাধীনতা আর সাহস নেই যে শমিতার সঙ্গে অসিতের দেখা করার ব্যবস্থা করিয়ে দিই।

কিন্তু ইতিমধ্যে অসিত শমিতাকে দেখার একটা ভালো ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

শমিতার বাড়ির পিছনে একটা সরু গলি ছিল। গলিতে শমিতাদের বাড়ির মুখোমুখি ছিল একটা গ্যাস্‌পোস্ট্‌। সন্ধ্যেবেলা সেটার তলায় এসে দাঁড়াত অসিত। শমিতা এসে দাঁড়াত তার তিনতলার বন্দীঘরের বারান্দায়। ওই যা একটু দেখা।

প্রথমা চকিতে তাকালেন দ্বিতীয়ার দিকে।

দ্বিতীয়া হাসলেন।

—আপনিই তো সেদিন বলছিলেন,—আমরা মানুষ, আমরা আর নতুন করে হব না। আমরা গোলমোহর নই। যারা সারাজীবন নির্লজ্জের মত ফুল ফোটায়। জীবনের মার খেয়ে যে মেয়েটা হেরে গেছে, পরাজিত হয়ে গেছে, তার কথা শুনতে আজ আর এত অবহেলা কেন?

ধরে নিন না পৃথিবীর আদালতে সে পরাজিত। তার আর আপীল পাবার আশা নেই। কিন্তু ভাবা যেতে পারে, ওপরে কোথাও ঈশ্বরের আদালতে একটা বিচার হয়। পৃথিবীতে পাপপুণ্যের তো আর নতুন কোনো বিচার হবে না। শহরে একটু হোকই আমার-আপনার আদালতে।

প্রথমা চাপা গলায় বললেন, আপনি কি বলতে চাইছেন আসলে?

—আসলে আমি বলতে চাইছি এই পৃথিবী এমন আজব জায়গা, যেখানে পর্যালোচনায় যদি দেখা যায়, ভুল বিচার হয়েছে, ভুল লোককে পুণ্য দেওয়া হয়েছে, তবে তার আর পুনর্বিচার হয় না। আপনার সঙ্কুচিত হবার কোন কারণ নেই। আমি তো শুধু গল্প বলছি। এ গল্প কোনো দিন সত্যি হয়ে উঠবে না।

যেমন আপনাকে জানাই প্রথম আলাপে লাবণ্যকে শমিতার খুব ভালো লাগল। শমিতা সেকথা আমাকেও বলেছিল। লাবণ্য সম্বন্ধে সে আমাকে যে সব ঘটনা বলেছিল তাতে আমারও লাবণ্যকে খুব ভালো লেগেছিল।

প্রথমা বললেন, ছলনা করে লাভ নেই, সত্যি বলুন তো আপনি কি আমার গল্পটাই আবার ফিরে বলছেন?

দ্বিতীয়া হাসলেন, একটা কথা আপনাকে বলি আজ। লাবণ্যকে এত বছর পরে আবার নতুন করে যখন দেখলাম, তখন আমার আরো ভালো লাগল। শান্ত, স্থির, সুন্দর। লাবণ্যর ওপর, বিশ্বাস করুন, আমার একটুও ঘৃণা নেই। যদিও পরিচিত পরিজন, ঘনিষ্ঠ স্বজন এখনো লাবণ্যকে ভালো চোখে দেখে না। বহুদিন হয়ে গেছে, আজ সে যৌবনের দিনগুলি আর ফিরে আসবে না। অসিতের কথা বলতে পারি না, তবে শমিতার কথা নিশ্চয়ই বলতে পারি, সে আর অসিতকে দাবী করবে না। কিন্তু লাবণ্যর কয়েকটা ভুল ধারণা আছে। আপনি সেদিন যখন আপনার কাহিনী বলছিলেন, তখন আমি চুপ করে শুনে গিয়েছিলাম। একটি কথাও বলিনি—বাধাও দিইনি। আপনার গল্প বলার ভঙ্গী অসাধারণ। কিন্তু আপনি যা বলেছিলেন তার প্রতিটি বিন্দুই কি সত্যি? যদি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন সব সত্যি, তাহলে হয়তো এত জ্বালা, এত দুঃখ আপনাকে কুরে কুরে খেত না। আজও জ্বালা নেই, রাগ নেই। কিন্তু এই জীবনের, এই শেষ হয়ে আসা দিনগুলোতে আর কেন নিজেকে ধোঁকা দেওয়া?

প্রথমা দ্বিতীয়ার কথায় কোনো বাধা দিলেন না। কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না। অনেক সময় খুব নিশ্চিত জেনে যেমন খুনীর হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয় অসহায় শিকার, তেমনি তিনি যেন বালিশে পিঠ দিয়ে আর একটু এলিয়ে বসলেন।

দ্বিতীয়া তাঁর পায়ের ওপর যে চাদরটি টেনে দিয়েছিলেন, সেটি কিছুটা ঠিক-ঠাক্ করে দিলেন।

শমিতাকে যখন তিনতলার ফ্লোরে নজরবন্দী করে রাখা হল তখন থেকেই অসিতের জীবনে লাবণ্যের ভূমিকা মুখ্য হয়ে উঠল। শমিতা বেরোতে পারে না, ঘুরতে পারে না, অসিতকে দেখতেও পায় না। অথচ লাবণ্য অসিতের সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। লাবণ্যর সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতার কথা অসিত কোনো দিনই শমিতার কাছে গোপন করেনি। কিন্তু শমিতার মামার বাড়ির আশ্রিত

আত্মীয়ারা, মাসি-দিদিরা এই লাবণ্যের সঙ্গে অসিতের মেলামেশার ব্যাপারটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল।…এ কথা তো স্বীকার করবেন, লাবণ্য ছিল বয়সে বড়। অসিতও বড়। শমিতা কিছুটা ছোট ছিল। ওদের চেয়ে অনভিজ্ঞও ছিল।

শমিতা যখন একা একা মনখারাপ করে বসে আছে, মাসি দিদিরা হয়তো তখনই মজলিশ রসালো ওর সামনে। কেউ পান সাজতে সাজতে, কেউ জাঁতি দিয়ে সুপারি কাটতে কাটতে মন্তব্য করল,—জানিস নে আমাদের অসিতবাবু আজকাল খুব লায়েক হয়ে গেছে!

—তাই নাকি?

—শুনি তো রোজ রোজ ওর দিদির বাড়ি যাচ্ছে!

—কেন রে?

—সেখানে একটা মেয়ে আছে। অসিতের জামাইবাবুর কিরকম দূর-সম্পর্কের বোন। তার নাম লাবণ্য। আমাদের এখানেও তো এসেছিল। কি রে শমি তুই দেখিসনি? তার সঙ্গে অসিতের এখন খুব দহরমমহরম!

—আমি তো শুনেছি মেয়েটা অসিতকে পুরো মুঠোয় পুরেছে।

শমিতা হাসত। মাসিরা জানেন না। ওর ব্লাউজের ভাঁজে লাবণ্যর আনা চিঠিতে রয়েছে অসিতের ভালোবাসা।

কিন্তু শমিতা জানত লাবণ্য সুন্দরী, লাবণ্য আর পাঁচটা মেয়ের মত নয়। তার নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। সব সময়েই অসিতের সম্বন্ধে তার একটা হারাই-হারাই ভাব ছিলই। আপনি সেই ভাবটাকে কিছুতেই অস্বাভাবিক বলতে পারেন না। বলুন, পারেন কী?

প্রথমা হাসলেন সামান্য। কিছু বললেন না।

এমনি কতবার লাবণ্য এসেছে। কত চিঠি এনেছে অসিতের,—লুকিয়ে লুকিয়ে। মাঝে মাঝে শমিতা আর অসিতের দেখা করারও ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সে পরম কৃতজ্ঞ ছিল লাবণ্যের কাছে।

—কিন্তু জানেন, লাবণ্য আর অসিতের মধ্যে যে আস্তে আস্তে একটা অদ্ভুত ধরনের টান, ভালোবাসার সম্বন্ধ গড়ে উঠছে সেটাও শমিতার বুঝতে বাকি ছিল না। অবোলা পশুরও একটা ষষ্ঠেন্দ্রিয় থাকে। পরম নির্বোধও বোঝে কে তার পরম আপন, কে তার পর। কোন দূরের মানুষ কাছে আসছে, কোন কাছের মানুষ যাচ্ছে দূরে সরে। সমস্ত ব্যাপারটা সে উপলব্ধি করত, কিন্তু

বলবার কিছু নেই তার। লাবণ্য এত ভালো, এত ভদ্র, এত সাহায্য করতে উৎসুক, যে কিছু বলাই যায় না তাকে।

লাবণ্যের বিষয়ে একটি কথা আপনি কিন্তু আপনার কাহিনী থেকে বাদ দিয়ে রেখেছিলেন। তার একজন গুণমুগ্ধ ছিল।

প্রথমা চোখ তুলে তাকালেন। তিনি যেন দ্বিতীয়ার মনের গভীরে পৌঁছোতে চাইছিলেন।

—কেন? আপনার সহদেব রায়কে মনে পড়ে না? দ্বিতীয়ার চোখ থেকে চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রথমা ধরা গলায় বললেন, মনে পড়ে!

—লাবণ্য প্রথম দিকে সহদেব রায়কে অনেক প্রশ্রয় দিয়েছে। অসিতের সঙ্গে লাবণ্যের যখন সামান্য রকমের একটা চেনাশোনা ছিল, তখনই সহদেব রায় লাবণ্যের অনেক কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। লাবণ্যলতা তখন সহদেবের সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে মিশত। সহদেব রায়ের কপাল কি জন্যে ভাঙলো তা জানা যায়নি কিন্তু এইটুকুই বলতে পারি, কিছুদিন পরে দেখা গেল লাবণ্য আর সহদেব রায়ের সঙ্গে তত ঘনিষ্ঠ নয়।

শমিতা এই সব খবরই পেত এবং অত্যন্ত বিকৃত ভাবেই সব খবর তার কাছে পৌঁছে যেত। কখনো খবর দিত তার মাসিরা, কখনো দিদিরা। কখনো বা তার বৌদিরা। কত রকম খবর। অসিত রোজ সন্ধ্যেটা আজকাল তার দিদির বাড়ি কাটাচ্ছে! অসুস্থ দিদিকে দেখতে যাওয়াটা নেহাতই একটা বাহানা। আসলে সে যায় লাবণ্যের টানে। একই খবর,—লাবণ্য আর অসিতের ঘনিষ্ঠতার খবর। কিন্তু এক একজন এক এক ভাবে বলত। লাবণ্য একরকম বলত, মাসিরা একরকম বলত, বৌদিরা আর একরকম, আবার অসিতও তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে বলত। কারো কথাই কারো সঙ্গে মিলত না। সেই প্রথম সন্দেহের শুরু। শমিতা সেই প্রথম পুড়তে শুরু করল।

শমিতার মনে সন্দেহের কাঁটা জাগিয়ে তোলার জন্যে সবচেয়ে দায়ী অসিতের দিদি। মহিলাকে যে আত্মীয়াই দেখতে যেত তার কাছে তিনি চুপি চুপি লাবণ্যের নিন্দায় সাতকাহন হতেন। সেই সাতকাহন লতায় পল্লবে চোদ্দকাহন হয়ে শমিতার কানে আসত। একটা কথা মনে রাখবেন, প্রথমত শমিতার বয়স ছিল কাঁচা। কারো সঙ্গে মিশতে পেত না সে, একান্নবর্তী পরিবারেও মানুষ হয়নি সে। তার বাস্তব জ্ঞানের অভাব ছিল। তাই এতগুলো বিভিন্ন

লোকের কাছ থেকে একই খবর যখন তার কাছে এসে পৌঁছোতে লাগল, তখন সত্যিই সে যেন কেমন বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে যে অসিতের সঙ্গে তার দেখা হয় না, কথা হয় না দিনের পর দিন, অথচ তার সঙ্গে লাবণ্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাচ্ছে,—হয়ত তার কথা আলোচনা করেই সময় কাটাচ্ছে,—না হয় তাই-ই হ'ল সেটাই শমিতার সইত না।

এদিকে লাবণ্যের সঙ্গে যখনই শমিতার দেখা হ'ত, তখনই সে শমিতাকে নানান উপদেশ বর্ষণ করত। লাবণ্যের উদ্দেশ্য ছিল অসিতের পড়াশুনো, কেরিয়ার যাতে ব্যাহত না হয়, তাড়াতাড়ি সে তৈরী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু শমিতা যেহেতু বাস্তব পৃথিবীর নিয়মকানুন কিছুই জানত না, সে লাবণ্যের উপদেশে বিরক্ত হ'ত। সবচেয়ে ক্ষতি করেছিলেন অসিতের অসুস্থ দিদি। মহিলা প্রত্যেকের কাছে লাবণ্যের নিন্দে করতেন।

লাবণ্য বলত, আচ্ছা শমিতা, তুমি অসিতকে এত ব্যস্ত করো কেন ?

—কিসের ব্যস্ত ?

—এই বিয়ে বিয়ে করে ? ওকে মানুষ হতে দাও আগে ?

শমিতার শরীর জলেপুড়ে যেত। যে জীবন সে যাপন করত, সেই বন্দী-জীবন থেকে তার মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় ছিল তার বিয়ে। সে বলত তুমি নিজে কখনো ভালোবেসেছো লাবণ্য ? ভালোবাসলে এমন কথা কখনো বলতে পারতে না। ভালোবাসা কখনো হিসেব করা ধরাবাঁধা পথে চলে না।

যেদিন লাবণ্য এসব উপদেশ দিয়েছিল শমিতাকে সেদিন শমিতা লজ্জায় ঘৃণায় উপুড় হয়ে একা একা কেঁদেছিল। কেঁদেছিল এই দুঃখে যে তার আর অসিতের মধ্যে যে সব গোপন কথার বিনিময় হয় তা লাবণ্যের অজানা থাকে না। লাবণ্যকে অসিত তার সব চিঠি দেখায়, কিংবা তার চিঠির কথা জানায়। অর্থাৎ তার আর অসিতের মনোবিনিময়ের মাঝখানেও লাবণ্য দিব্যি চলে এসেছে।

দেখুন একটা কথা বলি। বৈষ্ণব-পদাবলীতে আছে, শ্রীরাধিকা বলেছিলেন আমি গলায় হার পর্যন্ত পরি না কারণ আমাদের মাঝখানে যে হারের আড়াল থাকে সেটুকুও আড়াল আমার সয় না। বুকে চন্দন আঁকি না, কাপড়ও রাখি না —মনে পড়ে সেই,—'চির চন্দন উরে হার না দেলা, সো অধ নদী গিরি আঁতর ভেলা ...তাই ওখানে লাবণ্যের চালে একটু ভুল হয়েছিল। অবশ্য সে ভুলে লাবণ্যের কোনো দোষ হয়নি। সেই বা এমন কি বয়সী মেয়ে। তারও তো

অত হিষেব করে কথা বলার মত পাকা বুদ্ধি হয়নি। শমিতা আমাকে বলেছিল. —দেখ যে চিঠি অসিতকে লিখতে গিয়েই আমি হাজারবার করে ছিঁড়ে ফেলি, সেই চিঠি ও লাবণ্যকে পড়ায়। এ কেন? এ হবে কেন? আমার অসিত ছাড়া দিন কাটে, অসিত ছাড়া রাত কাটে। অসিতের সঙ্গে কথা হয় না, দেখা হয় না। কিছু বলতে পারে না, বোঝাতে পারে না। শুধু জ্বলেপুরে মরে।

আর লাবণ্য! লাবণ্য তো সেই অসিতকেই, যখনই ইচ্ছে করে তখনই পায়।

সুতরাং শমিতার একমাত্র সম্বলই হল চিঠি। চিঠি লেখা আর চিঠি পাওয়া।

ইতিমধ্যে আবার শমিতার জীবনে মহাবিপদ ঘনিয়ে এলো। তার ধনী পিতা আর ধনা দিদিমা তার বিয়ের ঠিক করে বসলেন। অত্যন্ত সুপাত্র। এক মস্ত স্টেটের উত্তরাধিকারী। শমিতাকে দেখে পাত্রের খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। পাত্রও চৌকোশ ছেলে। নামকরা স্পোর্টসম্যান, ভালো ছাত্র। শমিতা যা ভালোবাসে সঙ্গীত আর সাহিত্য, দুটোতেই তার দারুণ ঝোঁক! বিয়ের পরে ওরা ইয়োরোপে হনিমুন ট্যুরে যাবে, এটাও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শমিতা বিয়ের আগেই দুঃসাহস দেখালো। পালালো সে।

দ্বিতীয়া বললেন, জানেন সেরাতের কথা আমি কোনোদিন ভুলব না। ক'দিন ভাল করে খায়নি শমিতা। ওর গায়ে জ্বর ছিল। শমিতা আমাকে দেখার জন্য বায়না ধরেছিল বলে ওর দিদিমা আমার মা-বাবার কাছ থেকে বিশেষ করে অনুমতি নিয়ে আমাকে দু'তিন দিনের জন্য ওদের বাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। আসার সময় তিনি আমাকে পাখী পড়িয়েছিলেন, ওই স্টেটের মালিক তরুণ কুমার সাহেবের দিকে শমিতার মন ফেরাবার জন্যে।

আর সত্যি কথা বলতে কি, আমার তাতে অমত ছিল না। অসিত ছেলেটিকে আমি দেখেছিলাম। তাকে আমার খারাপ লাগত না, কিন্তু কেমন যেন দুর্বলচিত্ত বলে মনে হত। অন্তত শমিতার রূপগুণ প্রতিভার তুলনায় অসিতকে দুর্বল আর নিষ্প্রভ লাগত।

প্রথমা বললেন, শমিতার সঙ্গে অসিতের এই রোমান্টিক ইলোপমেণ্টের দিনগুলির কথা আমি কিছুই জানি না। অসিত ওই দিনগুলির কথা আমাকে কোনো দিনও বলেনি।

—আমি আপনাকে বলছি শুনুন,—যেদিন সে পালিয়ে গেল সেদিন রাতে নিজের বিছানায় পাশবালিশ শুইয়ে তার গায়ে চাপা দিয়ে নকল চুল দিয়ে বেণী পাকিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে শমিতা সব ঠিক করে রাখল। তারপর সিঁড়ির মুখে যে প্রহরীটি সারারাত জেগে পাহারা দিত, তাকে ডিঙিয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমেছে। খিড়্‌কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অসিতের গাড়িতে উঠে পড়ে।

গাড়ি গিয়ে সোজা পৌছোল চাঁইবাসায়। সেখানে একটি বাংলোবাড়ি ঠিক করাই ছিল। সারাদিন ক্লান্ত ঝিম স্বপ্ন। অসম্ভব উত্তেজনা। অসিত কাছে আছে, এইমাত্র সান্ত্বনা। সকালের প্রথম আলোয় পাহাড়ে পাহাড়ে ছাওয়া, খোলামেলা জায়গায় মুক্তির গন্ধ, শীত-শীত ভাব,—নতুন পরিবেশ। কেবল অসিত, অসিত,—শুধু অসিত।

ঝুলভর্তি ঘর। খাট, বিছানা, আরাম-কেদারা। শমিতার শক্তি ছিল না, তবু সে নড়েচড়ে টেনে টেনে উঠে সেই ঘরদোর বিছানাপাতি পরিষ্কার করল। মাঠে নেমে তুলে আনল ফুলসমেত সবুজ পত্রগুচ্ছ। জল দিয়ে সাজিয়ে রাখল কাচের গ্লাশে। অসিত সেই ছিম্‌ছাম্ সাজানো ঘরখানি দেখে বলেছিল, শমি, এত কম আয়োজনেও তুমি এত সুন্দর করে ঘর সাজাতে পারো?

প্রথমা সবিস্ময়ে চোখ তুলে বললেন, আমার কথাগুলোকে মিথ্যে প্রমাণ করার জন্যই কি আপনি এই সব কথা বলছেন? আমি কিন্তু এখনো বলছি, শমিতা সত্যিই খুব অগোছাল ছিল।

—আপনি মিথ্যে কথা বলছেন একথা তো আমি একবারও বলিনি। কিন্তু সেই বিয়ের প্রথম দিনগুলোয় শমিতা তেমন অগোছালো ছিল না। এখনো যখন তার কাছে যাই দেখি সে যথেষ্ট পরিছন্ন ভাবে থাকতে জানে।…থাক সেদিনের কথা বলি,—ডাক-বাংলোর চৌকিদার রাত্রে ওদের মুরগির ঝোল আর গরম ভাত দিল। রাত্রি। শেজের বাতি। পাশাপাশি দুটি আলাদা বিছানায় শোওয়া। তাও বেশিক্ষণের জন্যে নয়। মধ্যরাতেই অসিতের বাবা দিদিরা এসে পড়বেন। হাতে হাত রেখে চুপচাপ পাশাপাশি অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে রইল দুজন। সে সব অসম্ভব মুহূর্ত্ত। কখনো ঝরে পড়ছে ভোরের শিউলির মত, কখনো মুসলধার বৃষ্টি। উত্তপ্ত, স্নিগ্ধ, অসাধারণ। কিন্তু আপনাকে আজ কয়েকটা প্রশ্ন করি। শমিতার বিয়ের বিষয়ে। আচ্ছা আপনি বলুনতো, লাবণ্য যদি অসিতের এতই প্রগাঢ় বন্ধু ছিল, তাহলে সে বৌদিদের সঙ্গে এল না কেন? সহদেব

রায়ের সঙ্গে অসিতের বিয়ের আগের কিছুদিন ঘনিষ্ঠ হল কেন? যাক্‌ শমিতার কথায় ফিরে আসি। খানিকক্ষণের জন্যে ঘুমে চোখ লেগে এসেছিল শমিতার। কিন্তু গাড়ির পর গাড়ি এসে হাজির। অসিতের দিক থেকে কারো কোনো অমতই ছিল না। অসিতের মা ছিলেন না। ওর বাবা-দিদিরা, কাকা, খুড়তুতো দাদা-বৌদিরা সবাই হাজির।

শমিতা লক্ষ্য করল অসিত প্রথমেই প্রশ্ন করছে, লাবণ্য আসেনি?

কে যেন কি বলল একটা।

তারপরই অসিত গিয়ে দাঁড়ালো বাংলোর বারান্দায়। শূন্য অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

শমিতা বলল, কি, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো যে একা একা? লাবণ্য, আসেনি বলে মনখারাপ?

—লাবণ্য নাকি খুব অসুস্থ, শমি?

শমিতার মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠেছিল। ঠাণ্ডা গলায় সে বলেছিল, সত্যিই তো, তোমার বিয়েতে লাবণ্য নেই—ভাবতেও খারাপ লাগছে!

অসিত কোনো উত্তর দেয়নি। শমিতা আবার বলেছিল, বরং কনে না হলেও তোমার বিয়ে হ'ত, কিন্তু লাবণ্য না হলে···

কথাটা বলতে গিয়ে শমিতা ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত চমকে উঠেছিল। হয়ত অসিতও চমকে উঠেছিল।

অবশ্য বেশিক্ষণ সেই মেঘলা মুহূর্তগুলো স্থায়ী হয়নি। কারণ বাংলোবাড়ির শান্ত পরিবেশে বয়ে গিয়েছিল খুশির লহর। ফুল মালা চন্দন গন্ধ, গান, খিলখিল হাসি, ঘিয়ের প্রদীপ, পুরোহিতের মন্ত্র···

তারপর আবার সব চুপচাপ। শমিতা আর অসিতকে হনিমুনের নির্জনতায় রেখে সবাই ফিরে গেল।

ডাকবাংলোয় ওদের মধুচন্দ্রিকার কটা দিন অতুলনীয়। ভোরবেলায় শমিতা একা উঠে অসিতের জন্যে চা বানিয়ে আনত। চা বানাতে হাত কাঁপত। পেয়ালা চল্‌কে চা পড়ত। কিন্তু চায়ের রঙ সোনালী। কাজকর্ম ভালো ভাবে করতে চেষ্টা করত শমিতা। অর্ধেক কাজই ভালোকরে করতে পারত না। কিন্তু তার সেই 'চেষ্টা' দেখতেও ভালো লাগত অসিতের।

মুখে চোখে ঘুম নিয়ে, নরম ফ্লানেলের রাতপোশাক পরে অসিত সারা সকাল শমিতার পাশে পাশে ঘুরত। তারপর গল্প আর কথা। অনর্গল। কখনো

টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার বেঁধে নিয়ে দুজনে পাড়ি দিত মাঠ ভেঙে। নদীতে স্নান, বনভোজন—তারপর ক্লান্ত হয়ে ফেরা।

কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে ক্বচিৎ মেঘ ঘনাতো বৈকি। বাংলোয় ফিরে এসেই অসিত লাবণ্যর চিঠি এসেছে কিনা খোঁজ করত। হয়তো বলেই বসত, কে জানে লাবণ্য কেমন আছে ? ওর যে কি শক্ত অসুখ করল !

শমিতারও খানিকটা চিন্তা হত লাবণ্য সম্বন্ধে। কিন্তু সে কিছুই প্রকাশ করত না।

এক মাস কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল। দুজনে আবার কলকাতায় ফিরে এল।

কলকাতায় আসার পর শমিতার দিদিমা মাসিমা বাবা সবাই এলেন। না এসে উপায়ই বা কি ? ওই তো একটা মেয়ে। ওকে কেন্দ্র করেই এতগুলো মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ঘুরছে।

ফার্ন রোডে নতুন বাড়ি ওদের। শমিতা বাড়িতে এসে দেখল সব কিছু সাজানো-গোছানো। শুধু শমিতার আসার অপেক্ষা। আমিও সে ঘর দেখেছি। আপনার বর্ণনা ঠিক।

শমিতা দেখল লাবণ্য তার জন্যে কোনো কাজ কোনো কৃত্য অবশিষ্ট রাখে নি। তবু দু'একটা আসবাব একটু এদিক ওদিক করতে গেল। কিন্তু তা আর মানায় না। বাজে বেমানান লাগে। লাবণ্যর ঘর সাজানো, অংকের মত নিখুঁত। যাকে বলে কারেক্ট্।

আমরাও শমিতার ওখানে হাজির হলাম।

—কিরে শমিতা, তোর বিয়ের নেমন্তন্নে আমাদের বাদ দিবি ?

—না না, বাদ দেব কেন ? যদি কিছু করি তাহলে নিশ্চয়ই তোদের ডাকব!

—কেন, কোনো উৎসব-টুৎসব করবি না ?

—নাঃ, তা কেন ? কিন্তু……

শমিতার ফ্যাকাশে মুখ দেখে আমরা আর কোনো কথা বাড়ালাম না।

সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে শমিতা অসিতকে বলল, লাবণ্য তো এক-দিনও এলো না ?

—তুমিও তো যাওনি লাবণ্যর ওখানে !

শমিতা বলেছিল,—আমার বন্ধুদের একদিন নেমন্তন্ন করবে না ?

—নিশ্চয়ই।

—কি মজা! জানো ওরা সবাই আজ দল বেঁধে নেমন্তন্ন চাইতে এসেছিল!

—সত্যি!...আচ্ছা শমি, তুমি আমার বন্ধুদের নেমন্তন্ন করবে না?

—করব।

শমিতা উৎসাহে উঠে বসেছিল।

—বেশ হবে। আমি তোমার বন্ধুদের নেমন্তন্ন করব, আর তুমি আমার বন্ধুদের!

অসিত বলল, তাহলে তোমাকে লাবণ্যর বাড়ি যেতে হয়।

শমিতা বলতে যাচ্ছিল—যাব না কেন?

হঠাৎ তার সারা গা রি-রি করে উঠল। সে ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারল অসিত এতক্ষণ তাদের কথোপকথন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নামিয়ে আনছিল এই শেষ বাক্যটিতে পৌঁছোবার জন্যে। সে বলতে যাচ্ছিল এক কথা, তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল অন্য কথা।

লাবণ্য, লাবণ্য, লাবণ্য—খালি লাবণ্য—কেন? লাবণ্য ছাড়া তোমার কি আর কিছু নেই? কোনো বন্ধু নেই?

অন্ধকারে অসিতের মুখ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। শমিতা অন্ধকারে অসিতের মুখের রেখাগুলি খুঁজতে চেষ্টা করল। তার মনে হ'ল অন্ধকার তুটি গর্তে তু টুকরো আগুন জ্বলছে।

দপ্ করে যেমন জ্বলে উঠেছিল শমিতা তেমনি অসিতের ক্রোধ দেখে নিভে নরম হয়ে গেল সে। গলা নেমে এল তার। পরম স্নেহে সে অসিতের মাথাটা নিজের বুকের কাছে টেনে নিল।

—রাগ কোরো না তুমি। আমার দোষ হয়ে গেছে। আমি যাবো যাবো, লাবণ্যর বাড়ি যাবো ওকে নেমন্তন্ন করতে। বলেছি তো! কিন্তু একটা কথা, লাবণ্যই বা কেন এল না? ও তো আসতে পারত। এত করে ঘরবাড়ি সাজিয়ে দিল, সে বাড়িতে আমরা কেমন আছি তা দেখতে আসবে না!

অসিত কেমন শুকনো কঠিন গলায় বলল, দেখো শমি, একটা কথা কখনোই ভুলো না। কার জন্য আজ তোমাকে আমি পেয়েছি, কিংবা আমাকে তুমি পেয়েছো? তোমার মাথা নীচু করে লাবণ্যর কাছে যাওয়া উচিত।

শমিতার মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলে উঠল।

—না, এ কথা যদি বলো, তাহলে আমি কখনই লাবণ্যের কাছে যাব না। লাবণ্যর জন্যই শুধু আমি তোমায় পেয়েছি? আমার কোনো সাধনা ছিল না?

কোনো কষ্ট ছিল না ? না, লাবণ্য আসবে না। লাবণ্যের ছায়াও না। সব সময় এত লাবণ্য-লাবণ্য আমার ভালো লাগে না। আমি পাগল হয়ে যাবো !

অসিত বলল, বেশ, তাহলে কোনো উৎসবও হবে না।

—হবে। কেন হবে না ? আমি উৎসব করব, আমি আমাদের সত্যিকার বন্ধুদের নেমন্তন্ন করব।

শমিতা বিছানা থেকে উঠে গিয়ে বাইরের ঘরের ব্যালকনিতে গিয়ে একা একা দাঁড়াল। তার চোখ জলে ভরে এলো। গ্লানিতে যন্ত্রণায় সে যেন দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে ক্রমশ দারুণ ছোট মনে হতে লাগল তার। মনে হ'ল সে অকারণে লাবণ্যকে প্রাধান্য দিয়ে ফেলছে। আবার সেই পুরোনো কথা মনে হ'ল। সে হয়ত লাবণ্যের প্রতি অন্যায় করছে। অসিতের ওপর রাগ ফলাবার জন্যেই তার একবার মনে হ'ল লাবণ্যকে সে ডেকে আনে। আবার মনে হ'ল, নাঃ, যাবে না সে। লাবণ্য অসিতকে গ্রাস করবে। লাবণ্যর বন্ধুত্ব-টাই সর্বনেশে। অশুভ।

শমিতাকে খুঁজতে খুঁজতে অসিত এসে দাঁড়ালো তার পাশে। সে এতক্ষণ এই কথাই ভাবছিল হয়ত। আস্তে করে লাবণ্যর দু'কাঁধে হাত রেখে সে বলল, —ছিঃ শমি, পাগলামি করো না, শোবে চলো।

—তুমি কথা দাও, আমাদের পার্টিতে লাবণ্য আসবে না ?

—বোকা মেয়ে, তুমি লাবণ্যকে এতো ভয় পাও কেন ?

—কি করব, আমার যে বড় ভয় করে !

—সহদেব রায়কে চেনো ?

—যাকে লাবণ্য রিফিউজ করেছিল ?

—তার সঙ্গে এখন লাবণ্য আবার……

হয়তো সে রাত্রের মত দু'জনের ভাব হয়ে গেল, কিন্তু তারপরও সকাল আছে।

সকালে চায়ের কাপটা মুখের কাছে তুলতে গিয়েই শমিতা দেখলো অসিতের মুখ গম্ভীর, তার চোখে জ্বালা।

শমিতা সেদিন আর চা খাবার ভাত কিছুই খেতে পারল না। অসিত আফিসে চলে যাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে পড়ল।

এ কি ! এ কি হ'ল ! শমিতা ভেবেছিল বিয়ের পর অসিতকে পাবে, হাতে স্বর্গ পাবে। কিন্তু সব এত অন্যরকম হয়ে গেল কেন ?

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে। শমিতা বিছানায়

পড়েই আছে। কে তাকে দেখে, কে তাকে জোর করে কিছু খাওয়ায়? যেন অনেক জ্বর, শরীর এত ভারী। সকালের পাট তোলা হয়নি। চায়ের বাসন নড়েনি। ঝি-চাকর দাদাবাবু দিদিমণির ব্যাপারটা বুঝে গেছে। দু'জনেই সংসার-অনভিজ্ঞ। কিছু জানে না, বোঝে না। জানতে বুঝতে চায়ও না। সব উচ্ছৃঙ্খল। বিশৃঙ্খল। আর ঝি-চাকররাও তো এই সব চায়। এতে তাদের সুবিধে। জিনিসপত্র সরানো, চুরি আরো কত কি। তারা যতটা পারে, এই দুজনের ঝগড়ায় ইন্ধন যোগায় আর বাইরের রকে বসে গল্প করে। কেবল বিস্ফোরণের গল্প।

এমনি একদিন সন্ধ্যেবেলা কলিংবেল বাজল। লাবণ্য আর সহদেব বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। শমিতাকে দেখে বলল, বেড়াতে গিয়েছিলাম লেকে, তোমার সংসার দেখতে এলাম।

শমিতা ওদের বাইরের ঘরে বসালো। অনেকক্ষণ বসল লাবণ্য। শমিতা বুঝতে পারল অসিত না আসা পর্যন্ত লাবণ্য বসবেই। উঠবে না। অথচ লাবণ্য অসিত সম্বন্ধে একটি প্রশ্নও করল না। যেন সে শমিতারই বন্ধু। অসিতকে সে চেনে না। এমনি সময় অসিত অফিস থেকে ফিরল। লাবণ্য সেদিকে কোনোরকম মনোযোগ দিল না। যেন সে সহদেবকে নিয়ে অসিতকে দেখাতে এসেছে, সে সহদেবের সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠ। আর সহদেব, বেচারী সহদেব আশ্চর্য সাইফার! লাবণ্য যেমন চালাবে তেমনি চলবে।

শমিতা প্রথমে ব্যাপারটা ধরতে পারেনি। কিন্তু ক্রমশ সে লাবণ্যর গূঢ় উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরেছিল।

লাবণ্য বলছিল, আজ আমরা লেকে অনেকক্ষণ বসেছিলাম, বেশ লাগছিল তাই না সহদেব?

সহদেব মন্ত্রমুগ্ধের মত বলেছিল, হ্যাঁ, লাবণ্য।

—জলের কাছে, ঘাসের কাছে, আকাশের কাছে···অনেক দিন পর···কি যে ভালো লাগছিল! তোমার মনে পড়ে অসিত, সেই শমিতার চিঠি দেবার জন্য তোমার সঙ্গে লিলিপুলে মিট্ করতাম!

লাবণ্য হাসছিল, কিন্তু শমিতা লক্ষ্য করল অসিতের চোয়াল অনিচ্ছাসত্ত্বেও শক্ত হয়ে উঠছে। সহদেবের সঙ্গে লাবণ্যর ঘোরা, বেড়ানো অসিতের কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে। লাবণ্য কথা-কুশলী। তার ওই অদ্ভুত কৌশলে, থেমে থেমে ছেড়ে ছেড়ে, কিছু না বলে অনেক কিছু বলা কথার দু'ধারে ছুরির ধার

ছিল। সেই দু'দিকের ধারে এক দিকে শমিতা কেটে যাচ্ছিল, আর এক দিকে অসিত।

অসিত আর লাবণ্যর অনেক ঘনিষ্ঠতার কথাই শমিতা এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানত না। অসিত লাবণ্যর এত খুঁটিনাটি কাজকর্ম যে করে দিত তা শমিতার ধারণাতেই ছিল না। আবার অসিতও জানত না যে, যে সব খুঁটিনাটি কাজকর্ম সে করে দিত, সে-সব কাজ আজকাল সহদেবই করে দেয়। সহদেবই ক্রমশ অসিতের অন্তরঙ্গ জায়গাটি নিয়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ লাবণ্য শমিতাকে বুঝিয়ে দিল, অসিত তার কতটা দখলে ছিল, আর অসিতকে বুঝিয়ে দিল এখন সে অসিতের দখল থেকে কতটা দূরে সরে চলে গেছে।

প্রথমা বাধা দিলেন, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমি সহদেবকে কোনো দিনও ভালোবাসিনি।

দ্বিতীয়া হাসলেন। যেন ছেলেভুলোনো কথাটির নির্গলিতার্থ তাঁর বুঝতে আর বাকি নেই,—ভালো না বেসে, কাউকে ব্যবহার করা কি আরো গর্হিত কাজ নয়? অসিতের সঙ্গে আপনার যে তীব্র মানসিক বোঝাপড়া চলছিল, তারই সূত্রে আপনি সহদেব রায় নামে একটি সরল উত্তীয়কে, যে নাকি সত্যি সত্যিই আপনাকে ভালোবাসত, তাকে কলের মত বর্মের মত ব্যবহার করেছিলেন। সে যে কতখানি ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে সেদিকে আপনি লক্ষ্যও রাখেন নি।

কিন্তু সেও তো মানুষ। আপনি না-হয় তাকে একটুও একবিন্দুও ভালোবাসতেন না, কিন্তু সে তো আপনাকে ভালোবাসত। আপনি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে আপনার তাড়া খেয়ে বেরিয়ে যেত, আপনি আবার তাকে দু'দিন বাদেই ডেকে আনতেন। তার বাড়িতে দেখা করার জন্য স্লিপ্‌ রেখে আসতেন। আপনার যদি নার্ভ বলে কোনো বস্তু থাকে, তাহলে ধরেই তো নিতে হবে সহদেবেরও নার্ভ বলে কোনো বস্তু ছিল।

যাক এবার গল্পটা বলি। আপনি ঠিকই বলেছিলেন আপনার গল্পে। পরদিন অসিত রাত করে বাড়ি ফিরেছিল। সে কোথায় গিয়েছিল তা শমিতা জানত। তার পরের দিনও অসিত দেরি করে ফিরল। তারও পরের দিন।

শমিতা কি ভেবেছিল, আর কি ঘটে গেল! শমিতা ভেবেছিল বিয়ের পর সে স্বর্গ হাতে পাবে। সেই স্বর্গের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে নরক সয়েছিল! অথচ আশ্চর্য, বিয়ের তিন মাস যেতে না যেতেই আবার শমিতা যে একা সেই

একা। বিনা কারণেই একা। যে অসিতের জন্য সে দিদিমাকে ছেড়েছিল, বাবাকে কষ্ট দিয়েছিল, সেই অসিতই তাকে ছাড়ল। এ তো সরষের ভেতরেই ভূত।

শমিতার ঘরসংসার সব মিথ্যে হয়ে গেল। একটা মিথ্যে সংসারকে সে মিথ্যে ভাবে সাজিয়ে রাখতে পারেনি, সে অভিনয় করতে পারেনি, পদে পদে ধরা পড়ে গেছে। লজ্জা পেয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে অসিত অদ্ভুত সব কাণ্ড করত। বোধ হয় সেজন্যেই শমিতার আরও অপমানিত মনে হ'ত নিজেকে। হঠাৎ হঠাৎ এক-একদিন এসে শমিতার সঙ্গে দারুণ ভাব জমাতো অসিত। ছোট ছোট খামখেয়ালী বাচ্চারা যেমন হঠাৎ খেলনা পুতুলের স্তূপ থেকে সুন্দর একটি পুতুলকে তুলে নেয়। কিছুক্ষণ সেটাকে কোলে কাঁখে নিয়ে ঘুরেফিরে বেড়ায়। শমিতাকে বলত, শমিতা, আজ দারুণ করে সাজগোজ করো তো। চলো দুজনে মিলে বাইরে যাবো, সিনেমা দেখবো। শমিতা অসিতের খেয়ালখুশি কখনো কখনো মেটাতো। কখনো বা বিদ্রোহও করত। কিন্তু শমিতা বুঝতে পারত সে অসিতের সঙ্গে থাকলেও অসিত কিন্তু তার সঙ্গে নেই। অসিত অন্যমনস্ক। তার শরীরটাই শমিতার সঙ্গে ঘুরছে, ফিরছে, ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, কিন্তু মনটা নয়। আমি সে-সময় শমিতাকে দেখেছি।

অসিত তখন জানতও না, শমিতার শরীরের গভীরে আর একটি জীবন সঞ্চারিত হয়ে উঠছে।

শমিতা একদিন অসিতকে সোজাসুজিই জিজ্ঞেস করেছিল, অসিত কিসে সুখী হবে? শমিতা চলে গেলেই কি সে সুখী হবে?

অসিত সে কথার কোনো সোজাসুজি উত্তর দিতে পারেনি। আমার কি মনে হয় জানেন, লাবণ্য যতবারই অসিতকে লাগাম আলগা করে শমিতার কাছে পাঠিয়ে দিত, নিজের দাম্পত্যজীবন নিয়ে নানা ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতো, শমিতা যেন ততই অসিতের কাছ থেকে দূরে চলে যেত। হ্যাঁ স্বীকার করছি, শেষের বাঁধনগুলো ছেঁড়বার সময় শমিতার অসহ্য কষ্ট হয়েছিল। প্রথম সন্তানধারণের দুঃখময় অভিজ্ঞতা, মানসিক যন্ত্রণা, সব হারানো, সব দেউলিয়া হয়ে যাবার বেদনা সত্যিই শমিতাকে একটা কলহপ্রিয় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অস্বাভাবিক মানুষ করে তুলছিল। শেষ পর্যন্ত শমিতা অসিতের সঙ্গে অসিতের দিদির বাড়ি কদিন কাটাতে এলো।

সেখানে এসেই সে বুঝলো সে একেবারেই হেরে গেছে। সে আরো বুঝল, সে মাঝখানে বাধার দেওয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে বলে লাবণ্য আর অসিত পরস্পরের জন্য শেষ হয়ে যাচ্ছে।

শমিতা একদিন অদ্ভুত একটা কথা বলেছিল আমায়। বলেছিল, ছাখ আমাদের মধ্যেকার একটা মরা ভালোবাসার মান রাখবার জন্যে আমার বর শহীদ বনে যাচ্ছে! আমি ওকে শহীদ হতে দেব না। ও যে কতখানি রক্ত-মাংসের মানুষ, কতখানি সাধারণ মানুষ সে কথাটাই সকলের সামনে তুলে ধরব।

তাই শেষ পর্যন্ত একদিন সকালবেলা শমিতা হঠাৎ-ই তার বাবা আর দিদিমার কাছে ফিরে গিয়েছিল। তারপর তাকে উকিলের চিঠি দিতে হয়। তার মধ্যে তিন বছর আলাদা থাকার অর্থাৎ সেপারেশনেরও প্রশ্ন ছিল।

প্রথমা বললেন, আর একটু কফি হলে হয় না?

দ্বিতীয়া হাসলেন, সত্যি শীতকালে এত ড্রাই লাগে, মাঝে মাঝে গলা শুকিয়ে যায় বৈকি!

কেট্‌লিতে জল চাপিয়ে স্যুইচ্ অন্ করে দিয়ে, কাপ ডিস সাজাতে সাজাতে দ্বিতীয়া বললেন, আপাতত শমিতার কাহিনী রাখি, লাবণ্যের কথা শুনুন। লাবণ্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত সহদেব রায়কে প্যাভেলিয়ানে রেখেছিল। দ্বাদশ ব্যক্তি করে।

—শেষ পর্যন্ত মানে?

—অসিতের ডিভোর্স না মেলা পর্যন্ত।

কফির জল ফুঁসে উঠছিল। দ্বিতীয়া দ্রুত স্যুইচ্ বন্ধ করে দিলেন।

—যখন চূড়ান্ত খবর পাওয়া গেল অসিত ডিভোর্স পেয়ে গেছে, তখনই লাবণ্য তার সেই গ্রামের স্কুল থেকে, সেই নির্বাসন থেকে সহদেব রায়কে তার চরম পত্র পাঠিয়ে দিল। যাতে করে সহদেব রায় তার আশা ছেড়ে দেয়।

—তারপর সহদেব রায় কি করেছিল তা কি আপনি জানেন?

—ন্-না তো!

—জানতে ইচ্ছেও করেনি আপনার?

—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে বৈকি? একটা ভয়ঙ্কর গলাচাপা কণ্ঠ। রাতে ঘুম ভেঙে যায়, সহদেবের কথা মনে পড়ে যায়। নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়।

—শুনেছি তিন-চার বছর বাদে নার্ভাস ব্রেকডাউনের জন্য সহদেব রায়

সুইসাইড্ করে!

—সুইসাইড?

—হ্যাঁ, স্লিপিং পিল খেয়ে!

গরম ধোঁয়া-ওঠা কফির পেয়ালা দুটি জলচৌকির ওপর সাজিয়ে দিয়ে দ্বিতীয়া বললেন, নিন গরম কফি খান। ঘুম আসছে মনে হচ্ছে আপনার, ঝিমুনিটা কেটে যাবে। হ্যাঁ, তারপর কাহিনীর শেষটা বলি এবার।

শমিতা এম. এ. বি. টি পাস করেছিল। তার একটি মেয়েও হয়েছিল। কিন্তু শমিতা এমন অদ্ভুত ভাবে নিজের অস্তিত্বকে লুকিয়ে ফেলেছিল যে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব শমিতার কথা ভুলেই গিয়েছিল প্রায়। অসিত শুনেছিল তার একটি মেয়ে হয়েছে। কিন্তু তখন সে শমিতার কথা ভাবতে ব্যস্ত না, লাবণ্যকে ফিরে পাবার চেষ্টাতেই উন্মাদ। তারপর যা যা ঘটল তা তো আপনার গল্পে শুনেইছি। লাবণ্যর সঙ্গে অসিতের বিয়ে, তাদের মিলিত সুখী জীবনযাপন।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে প্রথমা হাসলেন। ঠাট্টার সুর বাজল তাঁর কথায়, বেশ বলেছেন কিন্তু, সুখী জীবনযাপন! কিন্তু এখন যদি কাহিনীর শেষটুকুতে সত্যিই কি ঘটেছিল আপনাকে ফিরে বলি, তাহলে দয়া করে আমার পুরোনো মিথ্যাভাষণ, কিংবা বানিয়ে বলার অপরাধটুকু মার্জনা করবেন কি?

—যেমন?

—যেমন অসিত লাবণ্যর কাছে মোটেই যায়নি। লাবণ্য তার গ্রামের স্কুলে বসেই খবর পেয়েছিল, অসিত আর শমিতার ডিভোর্স হয়ে গেছে। সে দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছিল অসিতের জন্যে। কিন্তু অসিত আসেনি।

দ্বিতীয়া কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলেছিলেন, এমনটা কখনো কখনো হয় বৈকি!

দুঃখ যন্ত্রণা অঘটন মানুষকে কখনো কখনো দারুণ প্রবীণ করে তোলে। আমিও খবর নিতাম। নির্জন বাড়িতে চুপচাপ দিন কাটাতো অসিত। নিজেকে হয়তো বিশ্লেষণ করত। নিজের ভিতরকার ভালোমন্দ, ন্যায়অন্যায়ের যাচাই করার চেষ্টা করত। তারপর একদিন লাবণ্য অসিতের সঙ্গে দেখা করতে এলো। এত পথ বয়ে লাবণ্যের ফিরে আসা…অসিত কি লাবণ্য আর শমিতার ব্যাপারে সমান দুর্বল ছিল?—নাকি দু'জনের প্রতি আকর্ষণে তার সামান্যই তারতম্য ছিল, কে জানে?

শেষ পর্যন্ত লাবণ্যর পরামর্শেই অসিত লাবণ্যকে বিয়ে করে। লাবণ্যের পরামর্শেই অসিত এক বুনো জায়গায় কাজ নেয়। অসিতের চাকরিটাই এমন ছিল যে, তাকে দিনের পর দিন বছরের পর বছর কলকাতা থেকে দূরে নির্জন সব প্রজেক্টে প্রজেক্টে কাটাতে হয়েছিল। মাঝে মাঝেই অসিতকে কাজের খাতিরে বাইরে বাইরে ঘুরতে হ'ত—তাই না ?

—হ্যাঁ, তখন সত্যিই ছেলেকে নিয়ে একা একা নির্জন কোয়ার্টার্সে কাটাতে এত খারাপ লাগত !···অবশ্য এখন কলকাতায় এসেও, বাড়িটাড়ি করেও খুব যে একটা কিছু অন্যরকম লাগছে, তাও জোর করে বলতে পারি না !···যাক, অনেক গল্প হ'ল। এবার চলি। আপনার গল্পে সমস্ত ঘটনাটার সম্পূর্ণ একটা ছবি তৈরী হ'ল, তাই না ? নাহ'লে আপনার বা আমার কারো একজনের কাহিনী শুনলে পুরো নিটোল ঘটনাটার একটা পাশই মাত্র দেখা যেত। তাই না ?

—হ্যাঁ, চাঁদের একটা পিঠের মত। কিন্তু একটা কথা বলুন, শমিতাকে আপনি কি এখনো আগে যেমন অপরাধী মনে করতেন এখনো তেমনিই মনে করছেন ?

প্রথমা আন্তরিক কণ্ঠে বললেন, না। কখনোই না। আমিই তার কাছে অপরাধী হয়ে রইলাম।

দ্বিতীয়া বললেন, তবে দাঁড়ান, গল্পের শেষটুকু শুনে যান।

—আর শেষ শোনবার কি আছে ? গল্প তো কখনই শেষ হয়ে গেছে !

—না, হয়নি। আপনার জানার বাইরেও গল্পের অনেকখানি অংশ রয়ে গেছে। শুনুন বলি। একবার কারখানার কাছে অসিত হরিদ্বারের কাছাকাছি একটা ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছিল। ট্রেনে তার সঙ্গে হঠাৎ শমিতার দেখা হয়ে যায়। শমিতা তার মেয়েটিকে নিয়ে হরিদ্বার দেরাদুন মুসৌরীতে বেড়াতে যাচ্ছিল। অসিত। তাদের সঙ্গ নেয়।

শমিতার সঙ্গে মধুর একটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক ধীরে ধীরে ফিরে আসতে থাকে অসিতের। দুঃখে কষ্টে যন্ত্রণায় শমিতাও বদলে গেছে। শান্ত হয়ে গেছে। কেবল মেয়ের জন্যেই তার বাঁচা। বাবার বিরাট সম্পদের কথা সে আজও মেয়েকে জানায়নি। তখনো নয়। সে স্কুলে চাকরি করত। তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানজনক মেয়েদের পেশা। সঙ্গে থাকত মেয়ে। মা আর মেয়ের মিলিত জীবন। কিন্তু শমিতা বুঝতে পারত, মাতৃস্নেহের সঙ্গে পিতৃস্নেহও

একটি শিশুর জীবনে কত প্রয়োজনীয়। তাই সে হঠাৎ ট্রেনে দেখা হয়ে যাবার পর, অপ্রস্তুত অবস্থায় বাধা দিতে পারেনি। তারপর থেকে অসিত মাঝে মাঝেই দু'চার দিনের জন্য উধাও হয়েছে। সব সময়েই অফিসের কাজে উধাও হয়নি। কখনো কখনো অকাজেও। অর্থাৎ শমিতাকে দেখতে, মেয়েকে দেখতে।

আপনি কি জানেন, অসিত আর শমিতার মেয়ের গতবছর ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেছে! তিন বছর আগে রূপালি এম এ. পাস করে। শমিতা এখন আর চাকরি করছে না। বারাসতের কাছে সুন্দর একটি বাড়ি করে একা আছে। রূপালি তার ডাক্তার স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় চলে গেছে। তাই শমিতা বড় বেশি একলা। তার দিদিমা মারা গেছেন। বাবাও চলে গেলেন গত বছর। মাঝে মাঝে অসিত যায়। এই যা সান্ত্বনা। রূপালি চিঠি দিয়েছে,—তার স্বামীর পরীক্ষা শেষ হলেই সে ফিরে আসবে। তখন হয়ত শমিতা মেয়েকে নিয়ে আবার খানিকটা দুঃখ ভুলে সময় কাটাতে পারবে।

তবে সহদেব রায়ের সঙ্গে আপনার বিশ্বাসঘাতকতা কেউ ক্ষমা করেনি। শমিতার সঙ্গে আপনার বিশ্বাসঘাতকতার কথাও কেউ ভুলতে পারেনি। এতদিন পরেও নিজের জীবনের গল্প বলতে গিয়েও আপনি যে সব সত্যের অপলাপ করেছিলেন, তার জন্য আমিও আপনাকে ক্ষমা করতে পারিনি। জীবনও আপনাকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করেনি। পুরোপুরি শোধ নিয়েছে। আজ ঘর বাড়ি স্বামী পুত্র সব পেয়েও আপনি একেবারে একা। পরিত্যক্ত। আপনি জানেন না অসিত শমিতাকে প্রতি মাসে টাকা পাঠায়। মেয়েকে সে নিয়মিত চিঠি লেখে। মেয়ের বিয়েতে তাকে সম্প্রদান করেছে অসিত শমিতাকে পাশে রেখে। আসলে অসিতের জীবনের সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি কোথায় জানেন। অসিত আপনাকে যতটা ভালোবাসে, কিছু মনে করবেন না, হয়তো শমিতাকে তার চেয়ে আরও বেশি ভালোবাসে।

প্রথমা চমকে উঠলেন। তাঁর কোটরগত বিশাল বিশাল চোখ দুটি ঠেলে এই প্রথম জল উঠল। পুকুর কাটার পর যেভাবে সহসা জল উপচে আসে। তিনি দ্বিতীয়ার হাত দুটি চেপে ধরে ভিজেগলায় বললেন, আজ আপনি আমায় বাঁচালেন! ভেবেছিলাম অসিতের জীবনটা সার্থক করতে চেয়ে নষ্ট করে দিয়েছি আমি। তাই সে বাইরে বাইরে অমন করে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়। আমার মনে পাপের ওপর পাপ জমছিল। সেই পাপ কোনো দিন আমাকে সত্যিকার স্ত্রী হতে দেয়নি। আমাদের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে আমরা ভদ্র ফর্মাল কারেকট্।

কখনো সামান্য কথা নিয়েও কথা-কাটাকাটি করিনি। আজও করব না।

কিন্তু জানেন, উঠে দাঁড়ালেন প্রথমা, সোজা দীর্ঘ হয়ে, আজ আমি প্রথম অসিতের দিকে চোখ তুলে সোজাসুজি তাকাতে পারব।

—শেষ—